
ইন্দিরাদি'র
আরো
গল্প
594

॥ প্রাইজ ও লাইব্রেরীর উপযোগী কিশোর গ্রন্থ ॥

ইন্দিরাদি'র আরো গল্প

4'4

[মজার মজার গল্প মেলা]

॥ ইন্দিরা দেবী ॥

সিটি বুক এজেন্সী
প্রকাশক ও পরিবেশক
৪৪/১সি, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ

প্রকাশক ঃ
পি, দে
৪৪/১সি, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯।

মুদ্রাকর ঃ
সিটি আর্ট প্রসেস
১৫/এইচ/২, আরিফ রোড,
কলিকাতা-৬৭।

প্রচ্ছদপট ঃ
সুবোধ গুপ্ত

মূল্য ঃ সাত টাকা

—উৎসর্গ—

ববি, বনি
আর
মিষ্টু কে—

—লেখিকার অন্যান্য কিশোর গ্রন্থ—

পুতুলরা কথা বললো
ইন্দিরাদির মিষ্টি গল্প
রূপকথার দেশে


উপহার



পাশের বাড়ীর ছেলেটা

অনেকদিন বাড়ীটা বন্ধ ছিল। সুস্মি সেদিন দেখল বাড়ীটা খোলা হয়েছে আর মিস্ত্রীরা রং চং করে মেরামত করছে। তাহলে এবার ওখানে লোকজন আসবে—মনে মনে ভাবলো সে। অনেকদিন থেকে বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে ভেবেছে—যদি ওখানে কেউ বন্ধু-বান্ধব থাকতো, তাহলে কী যে ভালো লাগতো! কিন্তু সে আর হয়নি। তার চেয়ে তিন বছরের বড় দাদা রঞ্জন তাকেও হষ্টেলে চলে যেতে হলো—মা বলেন বাবার বদলীর চাকরী বলে তাদের নাকি পড়াশুনোর দুর্গতি হয়। দাদা যতদিন বাড়ীতে ছিল—বেশ ভাল লাগতো। দাদার সঙ্গে ঝগড়া হতো না এমন নয়, তবু দাদার সঙ্গে ভাবও কম ছিল না। দাদার কেবল ঐ একটা দোষ, কেবল বলবে—মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা সব বিষয়ে বড়। মেয়েরা আসলে যত বড়াই করে তা কিছু নয়। আর এই নিয়েই তো সুস্মির সঙ্গে ঝগড়া বাধে—আরো যখন ছোট ছিল, তখন তো মারামারি বেধে যেতো—শেষকালে সুস্মি বাবার কাছে গিয়ে নালিশ জানাতো আর রঞ্জন

বলতো, সেই তো হেরে গেলে আর নালিশ করতে বাবার কাছে ছুটতে হলো—বাবা হচ্ছেন ছেলে—সে কথা কি মনে আছে ?

বাবা অবিশ্যি আদর করে ভুলিয়ে দিতেন আর বলতেন, রঞ্জন কিছু জানে না সুস্মি, মেয়েরা কম কিসে ? ওসব কথা এখন আর চলবে না। রকেট করে সারা পৃথিবী পরিক্রম করে এসেছে মেয়ে,—মেয়েরা এখন ছেলেদের চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। আর প্লেন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন মহিলা পাইলট তোমাদের দূর্বাদি। তাঁর সব কথা তোমাদের কাছে শুনি—আর কত হিসেব দেবো বল ? সব তাতেই এখন মেয়েদের অগ্রগতি—কাজেই মিছে দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ কি ?

বাবার কথা সত্যি। কিন্তু দাদা হেরে যাক সেটাও তো সুস্মির ভালো লাগে না, তাই মাঝামাঝি রফা হয় প্রায় সময়। কিন্তু দাদা হস্টেলে চলে গেল—এটা একেবারে সইতে পাচ্ছে না সে। 'দাদা তুমি কবে আসবে' একথাপ্রত্যেক চিঠিতে লেখে সুস্মি—আর গরমের ছুটি, পূজোর ছুটি, বড়দিনের ছুটির জন্য বসে বসে দিন গোনে।

দাদা না থাকার জন্যই তার বড্ড একা লাগে। তাদের বাংলো এমনই যে কাছাকাছি কাউকে পাবার উপায় নেই। বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে সুস্মি মনে মনে কত প্রার্থনা করেছে, তার মত ছোট কেউ যেন আসে ও বাড়ীতে। বাড়ীটায় মিস্ত্রীর কাজ দেখে আজ সুস্মির আনন্দের সীমা নেই।

আচ্ছা মা, বলোতো ওদের বাড়ীতে ক'টা ছেলেমেয়ে আসবে ?

—আমি কি করে জানব বল ?—মা উত্তর দেন।

—বলো না, আন্দাজেই বল ; আমার মত একজন আর দাদার মত একজন হলে বেশ হয়—না ?

মা হেসে বলেন ঃ বেশ তো তাই আসুক না !

—হ্যাঁ, তাই আসুক। আচ্ছা মা, দাদা কবে আসবে বলো তো ? ক'দিন চিঠি আসেনি ?

—দাদা আসবে এই পূজোর ছুটিতে—চিঠি তো ও লেখে ঠিক নিয়ম করে। 'বেণী মন-কেমন করছে' একথা দাদাকে জানাতে পারে না।

কথা না বাড়িয়ে সুস্মি ঐ পাশের বাড়ীটার দিকে চেয়ে থাকে আর মনে মনে ভাবে তার মত যেন একটা মেয়ে থাকে, এছাড়াও যদি দাদার মত একটা ছেলে থাকে বেশ হয়।

রোজ সকালে উঠে সুস্মি দেখে বাড়ীটার কাজ কতদূর এগোলো। মাঝে মাঝে ভাবে বড্ড আস্তে আস্তে কাজ করে লোকগুলো। একদিন তো ডেকেই ফেল্লেঃ মিস্ত্রী ও মিস্ত্রী, তোমরা এত ধীরে ধীরে কাজ কর কেন গো ?

—কি বলছো খুকী ? বুড়ো সর্দার মিস্ত্রী জিজ্ঞাসা করে।

মা ভিতর থেকে বলেন ঃ কি হচ্ছে সুস্মি ? ওরা রাগ করবে না।

তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে সুস্মি ঢোক গিলে বলেঃ এই যে বলছিলুম, তোমাদের বুঝি এখনও অনেক কাজ বাকী ?

—তা এখনও চলবে। বাড়ীটা অনেক দিন বন্ধ ছিল কিনা।

—এটা কাদের বাড়ী, কতগুলি ছোট ছেলেমেয়ে আছে গো মিস্ত্রী ? বুড়ো মিস্ত্রী হেসে বলেঃ বাড়ী তো চক্রবর্তী বাবুদের, কত ছেলেমেয়ে আছে তা তো জানি না খুকী।

—এই আমার মত আছে একটাও, কিংবা দাদার মত ?

—আমি ঠিক বলতে পারবো না খুকী দিদি।

—আমি খুকী দিদি নই, আমি হলাম সুস্মি।

বুড়ো মিস্ত্রী আবার হেসে বলেঃ তা হবে।

শেষে একদিন বাড়ীর কাজ শেষ হলো, আর বাড়ীতে অনেক জিনিসপত্র আসতে লাগলো ; আরো পরে এলেন বাড়ীর সকলে। সুস্মি অনেক চেষ্টা করে অনেকক্ষণ জানলায় দাঁড়িয়ে থেকে আবিষ্কার করলো বড়রা অনেকেই আছেন, কিন্তু ছোট একজনকেই সে এখন দেখতে পাচ্ছে ? হাফ প্যাণ্ট আর সাদা হাফ সার্ট পরে তার মত একটি ছেলে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করছে। তাহলে মেয়ে একজনও নেই তার মত ? মনে মনে বল্লে সুস্মি আর ভাবলো, দাদার জিত হবে তাহলে। এই সব ভাবতে ভাবতে পাশের বাড়ীর জানালায় ছেলেটি এসে কখন দাঁড়িয়েছে দেখলো সুস্মি। ছেলেটি বল্লেঃ তোমরা বুঝি এই বাড়ীতে থাকো ?

সুস্মি খুশী হয়ে বল্লে ; হ্যাঁ, তোমরা নতুন এলে ? ক'জন ভাই-বোন ?

—এই তো আমি, আমার নাম কাজল।

—এসো না আমাদের বাড়ী।

ব্যস আর কি—দু'চার দিনের মধ্যে গলায় গলায় ভাব। সুস্মি কিন্তু একদিনও নতুন বাড়ীতে যায়নি, দাদা এলে তারপর যাবে। কিন্তু কাজলটা কি সুন্দর কথা বলে, কেমন মিষ্টি স্বভাব, আর কত ভালো—কিন্তু চুলগুলো মেয়েদের মত, তাহলেও বেশ দেখতে।

মাকে সেদিন সুস্মি বলল, দেখ মা—কাজলের চুলগুলো মেয়ের মত, রাত্তিরে আবার ওর মা রিবন দিয়ে বিনুনী করে দেন—অত চুল কেন মা ?

মা উত্তর দিলেন : বোধহয় মানত আছে, কিন্তু ওর মুখটি কী সুন্দর—একেবারে মেয়ের মত।

ছুটি পড়লো—সুস্মির দিন গোনা শেষ করে রঞ্জন এসে পড়লো বাড়ীতে। খুব হইচই-এর মাঝখানে সুস্মি কাজলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল দাদার—এই ছুটির আগে কাজলদের স্কুলে sports হয়ে গেলো। তাতে কাজল প্রথম হয়েছে অনেক বিষয়ে, আর অনেকগুলি প্রাইজ এনেছে।

রঞ্জন গম্ভীর হয়ে বল্লে : ছেলেরা হবেই, ও যদি মেয়ে হতো তাহলে হতো না।

—বাজে কথা বলো না—শোনো না আর কিসে কিসে কত কি করেছে, ওর গুণের শেষ নেই !

—ছেলে বলেই হয়েছে।

কাজলের সঙ্গে ভাব হয়েছে বটে, আর তার গুণের কথা অনেক করে বলা হয় দাদার কাছে কিন্তু তবু সুস্মি এখনও একদিনও ওদের বাড়ী যায়নি—কাজল মাঝে মাঝে আসে নাহলে জানলা দিয়ে কথা বলে।

রঞ্জন একদিন বল্লে : দেখ সুস্মি এবার এসে পর্যন্ত কাজলের গল্পই শুনছি, কত সে ভাল, কত সে বুদ্ধিমান—আর আমি যে বলি

ছেলেরা সকলেই এমনি হবে, মেয়েরা হলে হতো না, তা এখন বিশ্বাস হচ্ছে কি?

—তা কেন বিশ্বাস হবে, মেয়েরা কি পারে না পারে তা কি জানো না? তাহলে বাবার কাছে চলো—বাবার লিষ্ট আছে জানো?

—বাবা তার মেয়েকে ভোলান।

—কখনও না, বাবা সত্যি কথা বলেন।

—মা থামিয়ে দিয়ে বলেন; স্নিগ্ধ, উপরে যাও, জানালায় দাঁড়িয়ে কাজল তোমায় ডাকছে, বলেছে একদিনও কেন তুমি যাচ্ছ না ওদের বাড়ী।

স্নিগ্ধ মার আঁচল ধরে বল্লে: কি বলবো মা?

—বলগে বিজয়ার দিন যাবে।

পূজোর ক'দিন খুব আনন্দে আনন্দে কেটেছে, কাজল আবার ছাতে উঠে ঘুড়ি উড়িয়েছে। চমৎকার লাট্টু ঘোরায় কাজল, ওর ঘরে বসে খেলা একটুও ভাল লাগে না। ছোট ছেলেরা যা খেলতে পারে কাজলের একটিও অজানা নেই।

দাদার কেবলই এক কথা; একসঙ্গে এতগুণ সে কেবল ছেলে বলেই সম্ভব, মেয়ে হলে শুধু পুতুল খেলতো—না হয় বোকা বোকা কথা কইতো।

স্নিগ্ধ খুব রেগে যায়—মাঝে মাঝে ঝগড়াও বাধে। মা বলেন—ছেলে আর মেয়ে নিয়ে কী কাণ্ড তোমাদের, দিনরাত ঝগড়া কর কেন?

রঞ্জন হেসে বলে: মা তুমি কার দিকে?

স্নিগ্ধ চেঁচিয়ে বলে: আমার! আমার দিকে!

মা বলেন: আমি কারুর দিকে নই, নিরপেক্ষ! ছেলেরা অনেক কাজ করে যা মেয়েদের করা সুবিধা হয় না, তাহলেও মেয়েরা অনেক কিছু পারছে, যাতে ছেলেদের লজ্জা হয়—এই তো পরীক্ষার খবর বেরুলে কাদের নাম আজকাল আগে থাকছে? রিসার্চ করছে, ডক্টরেট হচ্ছে, দেশ-বিদেশে চলছে কৃতী হয়ে ফিরছে—এসব দেখলে

মেয়েদের কৃতিত্ব কম কোথাও—বরং ছেলেদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তাই ওসব নিয়ে তোমাদের ঝগড়া করা ঠিক নয়।

রঞ্জন হতাশ হয়ে বলে : মা তুমি যে কী বলো, দু'একটা মেয়ে কে কি করলো তাই নিয়ে বল্লে তো চলবে না, সাধারণভাবে বলো ?

—আজকাল মেয়েরা ছেলেদের হারিয়ে দিচ্ছে সব তাতে তা তো দেখছি।

—মা, দেখছি খুব খবর রাখো ! ছেলেদের কথা বলো না শুনি।

ঠোঁট উল্‌টিয়ে চোখ ঘুরিয়ে সুস্মি বল্লে : মা সব খবর রাখে—খবরের কাগজ মার মুখস্থ—জানো মশাই ?

উপরের জানলা থেকে কাজল ডাকলো : সুস্মি, শোন এদিকে।

এক দৌড়ে উপরে গেল, আবার তখনি নীচে নেমে হাঁপাতে হাঁপাতে সুস্মি বল্লে : মাগো মা, কাজল গাছে উঠে এই এত্তো—

—গাছে উঠে ? মা জিজ্ঞাসা করেন !

হ্যাঁ, ঐ যে শিউলী আর কৃষ্ণচূড়া—ঐ তো দেখ না—এত ফুল পেড়েছে, আমায় নিতে বলছে।

—কাজল গাছে উঠতে পারে নাকি ? হাত-পা ভাঙ্গলে ? মা বলেন।

সুস্মি তাড়াতাড়ি বলে উঠে : ওমা জানো না, ওর মা বলেন দস্যি মেয়ে !

রঞ্জন বলে উঠে : ভুল হলো সুস্মি—দস্যি ছেলে। মেয়ে হলে উঠতে পারতো না।

রাগ করে সুস্মি বলে : অত জানি না বাবা, ওর মা যা বলেন তাই বলছি। আমি যাই ডাকছে কাজল।

কাজল জানলায় দাঁড়িয়ে বলছে : আমার অনেক কাপড় জামা জুতো হয়েছে পূজোয়—তোমার ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক হয়েছে আমার—তেরোটা ফ্রক, সুন্দর, সুন্দর—মামার বাড়ী, মাসীর বাড়ী এখানে, বড়দিদু আর রাঙা মামা—আর দিদিভাই মানে আমার দিদিমা একটা শাড়ী দিয়েছেন—কিন্তু আমার একটাও পেটিকোট নেই, ব্লাউজ নেই, তাই ভাবনা হয়েছে।

আমারও অনেক হয়েছে প্যাণ্ট, সার্ট, ফ্রক, শাড়ী—কাজল মনে করবার চেষ্টা করলো। সুস্মি হেসে বল্লে শাড়ী ফ্রকও পরবে? হি-হি—কেমন দেখাবে তোমায়? রাত্তিরে যখন চুল বাঁধো ঠিক মেয়ের মত—

কাজলের মা ডাকলেন—মাষ্টার মশাই এসেছেন কাজল নেমে এসো।

—একদিন এসো না আমাদের বাড়ী সুস্মি? কতদিন আমরা এসেছি, তুমি কেন আসো না? মাকে নিয়ে আজ এসো, কেমন? কাজলের মা বারে বারে বল্লেন জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে।

রঞ্জন বললেঃ সুস্মি বুঝি এতদিনেও যাওনি একবারও? মেয়েদের কাণ্ড কি রকম দেখো! অথচ কাজল কতবার এসেছে। তোমার যাওয়া উচিত তা একবারও ভাবনি।

রঞ্জনের কথা শেষ হলো না—দেখা গেল কাজল তার মাকে নিয়ে এ বাড়ীতে ঢুকছে। রঞ্জন সুস্মির দিকে তাকিয়ে বল্লেঃ ছেলে বলেই ওর এত বুদ্ধি।

সুস্মি মাকে ডেকে আনলো—বারান্দায় সাজানো চেয়ারে বসেই সকলে গল্প করতে লাগলেন। কাজলের মা বল্লেনঃ কতদিন ভাবছি আসি, কিন্তু নতুন বাড়ীতে এসে গোছাতে গোছাতে সময় হয় না। আপনিও দিদি একবার যান না, তাই ভাবলাম এত ভাব ছোটদের মধ্যে আর আমরা কেউ কাউকে চিনি না এ ভালো না—তাই জোর করে চলে এলাম। কাজলের পড়া শেষ হলো বই নিয়ে উপরে উঠছিল, সবসুদ্ধ টেনে এনেছি।

সত্যিই তো ওর হাতে বই খাতা সবই রয়েছে। সুস্মির মা বল্লেনঃ খুব খুশী হলাম ভাই, কালই আমি যাবো, সত্যি আমারই ভুল হয়ে গেছে। বাড়ীটা বেশ হয়েছে আপনার।

কাজলের মা বললেন, আপনার বুঝি এই দুটি ছেলেমেয়ে? এদের কথা কাজল খুব বলে। আমার ভাই এই একটিই মেয়ে—এমন মেয়ে হয়েছে, ছোট থেকে একেবারে ঘোড়ায় চড়া ছেলের মত। আমার মা ওকে ছেলের মত সাজিয়ে রাখতেন। ওর হাবভাব কাজকর্ম

খেলাধুলো সব ছেলের মত, দেখছেন? বিস্মিত হয়ে স্নিস্মির মা বল্লেন: কার কথা বলছেন, কাজলের?

এক মুখ হেসে কাজলের মা উত্তর দিলেন: হ্যাঁ আমারই মেয়ে ঐ একমাত্র সন্তান—কাজলের কথাই বলছি। দেখুন না সব ওর ছেলের মত। সবাই তো ভাবে ঐ প্যান্ট-সার্ট পরা দেখে ও বুঝি আমার ছেলে।

স্নিস্মি, রঞ্জন ও তাদের মা পরস্পর মুখের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টি তাকালেন। রঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেছে। মা কথা বলার চেষ্টা করতে লাগলেন—স্নিস্মি কি করবে ভেবে না পেয়ে কাজলের হাতের একটা বই নিয়ে খুলে দেখতে লাগলো—যার প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা আছে: "কুমারী কাজল চক্রবর্তী"।



মিলি শিখলো

মিলি ক'দিন ধরে রেগে টং হয়ে আছে। কেন? ওমা কি যে বল। ঐ যে, ওর মাসতুতো ভাই—নন্দ—এখানে এসে আছে ছুটি কাটাতে। মা যখন ছোটমাসীকে চিঠি লিখছিলেন—নন্দ যেন ছুটিটা তাঁর কাছে এসে কাটায়—সেই পোস্টকার্ডখানা দেখে অবধি মিলির রাগের সীমা ছিল না। নন্দর উপর তার খুব রাগ। সবাই বলে, নন্দ নাকি খুব ভাল ছেলে। এতবার একথা মিলি শুনেছে—বিশেষ করে মার মুখে—যাতে মাঝে মাঝে মনে মনে সে গর্জে উঠতো—ভালো না ছাই, সব কাজ নিয়মমত করলেই ভালো হলো? মিলি না হয় অত সব গুছিয়ে করতে পারে না, তাই বলে সে মন্দ কিসে? স্কুলে যায় নিয়মমত, পড়াশুনাও করে। তবে আর কি! কিসে সে কম নন্দর চেয়ে? এই ক' মাসে কোনও দিন মাকে বুঝিয়ে পারে না। মিলি স্কুল থেকে এসে বই পত্তর ছড়িয়ে রেখে খেলতে যায়। খেলে ফিরে এসে এক পা ধুলো নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে—আর শোয়া মাত্রই রাজ্যের ঘুম যেন তার চোখে নামে। রাত্রে পড়া তৈরী, সকালে আটটায় স্কুল যেতে হয়-তাই আগের দিন বই গুছিয়ে রাখা,

জুতো পালিশ করা, স্কুল-ফ্রক ইস্ত্রি করে রাখার কথা একেবারেই ভাবে না। তাতে সকালে তার ত অসুবিধা হয়ই—মা-রও কম কষ্ট হয় না। বুবু বুলুরও স্কুল, বাবার অফিসের খাবার—এসব তদারক করতে হবে—কাজেই এত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন যে খুব বকুনী খেতে হয় মিলিকে—"এতটুকুও গুছিয়ে রাখতে পারো না আগে ভাগে ? দেখ তো আর সব মেয়েদের। বেশী দূর যেতে হবে না—নিজের ভাইকে দেখ। নন্দ কি সুন্দরভাবে নিজের কাজ করে, ওকে ক'বার বলতে হয় ?"

এই সব কথা শুনতে শুনতে মিলির কান ঝালাপালা হয়ে গেছে তো বটেই, আর নন্দর উপর সে খাপ-খোলা তলোয়ার হয়ে আছে—। একবার সুবিধা পেলেই ঘাড়ে বসিয়ে দেবে—এইরকম মনের ভাব তার।

মায়ের লেখা ছোটমাসীকে প্রথম পোস্টকার্ডখানা সে পোস্ট করে দেবে বলে হরির হাত থেকে নিয়েছিল—আর সেটা কুচি কুচি করে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে, অবিশ্যি এ ব্যাপার তার ক্লাসের রুবি ছাড়া আর কেউ জানে না। রুবি বলেছিল—তা বলে চিঠি ছেঁড়া তোর উচিত হয়নি মিলি, কাউকে ভালো বললে সহ্য করতে পারিস না কেন রে ?'

—তুই জানিস না রুবি, মা কেবল নন্দ 'এত ভাল তত ভাল' বলতে বলতেই অস্থির। আমরা যেন কেউ কিছুই নয়। কত আর শুনবো বল ? সে যখন উপস্থিত নেই তখন তো শুনবই, আর এখানে এলে তো রক্ষেই থাকবে না। কেবলই শুনতে হবে নন্দদার গুণের কথা তার সামনেই। ছিঁড়বো না চিঠি ?

—তা যতই হোক, চিঠিখানা না ছেঁড়াই ভাল ছিল মিলি।

—তুই আর কি বুঝবি বল রুবি! তোর তো শুনতে হয় না।

কিন্তু এসব হলে কি হয়, চিঠি যে আবার কবে গেল, কোথা দিয়ে কি হলো, তা কেউ জানলো না। ঠিক সময়ে নন্দ এসে উপস্থিত হলো।

মা হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন,—ক'খানা চিঠি লেখার পর মা

তোমায় ছাড়লো নন্দ ? মাসীর কাছে কি আসতে ইচ্ছা করে না রে ?

মাসীমাকে প্রণাম করে নন্দ উত্তর দিল—কই মাসীমা, মা তো মোটে একটি চিঠি পেয়েছেন আপনার ! আর তা পেয়েই বাবা মা বললেন,—তোমার তো যাওয়া উচিত। ছুটির দিনের শুরুতেই তুমি বেরিয়ে পড়ো। মাসীমা আছেন, মিলিরা ভাইবোন সব আছে, বেশ ভালো কাটবে।

সে কি রে নন্দ ! তিনখানা চিঠি দিয়েছিলুম যে ! বাবাঃ আজ-কাল ডাকের যে কী ছিরি হয়েছে। সময় মত যদি কিছু পৌঁছয় ! আশ্চর্য ! যাক্ বাবা, এসে যে পড়েছ এই ভালো ! আমি এত তোমার নাম করি সব সময় যে, ছেলেমেয়েরা বলে—তুমি নাকি বিষম খাচ্ছ।

মার কথাগুলো উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল মিলি। কথা আর বেশি দূর এগোলো না। মা আর ছোট ভাইবোনরা নন্দকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো দেখে মিলি আস্তে আস্তে সরে গেল।

সারাটা দিন মিলির বিশ্রীভাবে কেটেছে, কারণ সমস্তক্ষণ সেই চিঠি ছেঁড়ার কথা মনে হয়েছে আর যতবার নন্দ এসে কথা বলেছে —ভালো করে উত্তরও দিতে পারেনি। নন্দ বলেছে বারে বারে,— মিলি তুমি খুব গম্ভীর হয়ে গেছ দেখছি।

সেদিন মিলি টেবিল গোছাতে শুরু করলো। কোনোদিন যে হাতের কাছে কিছু পায় না টেবিল অগোছাল থাকার জন্য, আজ অনেক হারিয়ে-যাওয়া জিনিস উদ্ধার হলো। মনে মনে মিলি ভাবলো, এগুলো না পেয়ে বুবু বুলকে সে কত মার দিয়েছে, অথচ তারা বার বার সত্যি কথা বলেছে,—আমরা নিইনি। মিলি আবার ভাবলো, হঠাৎ তার মনে হলো, নন্দদার সঙ্গেও সে খুব খারাপ ব্যবহার করছে। আজ সে ভলো করে কথা বলবে, খেলা-ধূলোয় যোগ দেবে।

—মালবিকা মিত্র বুঝি আজ খুব কাজে মন দিয়েছে ?

পিছন ফিরে তাকিয়ে মিলি দেখলো, নন্দ হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। দপ করে যেন জ্বলে উঠলো মিলি। বললে, মালবিকা মিত্র রোজই কাজ করে, বুঝেছ ? কেবল আমার মা বলেন—তোমার মত

কাজের ছেলে নাকি ভু-ভারতে নেই।

নিজের কণ্ঠস্বরে মিলি নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়লো। নন্দ হাসি-মুখে বলল,—তাই নাকি? মাসীমা বলেন কেন জানো? খুব ভালোবাসেন তাই।

মিলি কোনও উত্তর না দিয়ে কাজ করতে লাগলো। নন্দ আবার বলল,—সাহায্য করবো?

—না থাক, মা এমনি বলবেন—ভাগ্যি নন্দ ছিল তাই গুছিয়ে দিল।

—আহাহা, মাসীমা বললেই বুঝি হবে। দাও, দাও আমায়।

এমন সময় মার আবির্ভাব হলো। কি রে, তোরা কি করছিস? খাবার দিয়েছি যে!

—যাই মাসীমা! মিলিকে একটু সাহায্য করবো ভাবছিলাম কিন্তু ও তা করতে দিচ্ছে না!

—করতে দিচ্ছে না? ও তো কোনও কালে কিছু গোছায় না, কিছু পরিষ্কার করে না, একেবারে আস্ত একটি জংলী ভূত।

বুলু বলে উঠলো,—ও মা, পেত্নী বল। ভূত হবে কি করে দিদি?

মা ধমকে উঠলেন,—খুব হয়েছে থাম—ফাজিল কোথাকার।

মিলি খুব রাগ করে বলে উঠলো,—মিলি পেত্নী, জংলী এই সব। আর ভালো কে—তোমার নন্দ আর বুবু বুলু।

মা হেসে ফেলে বলেন,—রাগ করলেই তো হবে না। নন্দ ভালো, একথা স্বীকার করতেই হবে। বুলু বুবু তো ছেলেমানুষ। তোমার দেখে শিখে কেমন হবে তা বুঝতে পাচ্ছি। আচ্ছা এখন তো চল, হাত ধুয়ে খাবে।

নন্দ একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেছে, তবু বলল,—মাসীমা, আপনি কিন্তু শুধু শুধু বকছেন। ঐ তো মিলি কেমন সব সুন্দর করে রাখছে।

মা বললেন,—দু'দিন থাকো, নিজেই দেখতে পাবে।

মিলির রাগ-জ্বলন্ত মুখের দিকে চেয়ে নন্দ আস্তে আস্তে বললে, —না, মিলি খুব ভালো।

আবার দপ করে উঠলো মিলি,—খুব হয়েছে, অত আর বলতে

হবে না।

এইরকম ছোটখাট ঘটনা প্রায়ই ঘটছে দেখে নন্দ সকলের অলক্ষ্যে মিলির টুকরো টুকরো কাজগুলো করে দিতো "আহা বেচারী এত বকুনী খায়",—এই মনে ভেবে। মিলি কিন্তু একদিন রাগ করে বললে,—কে তোমায় বলেছে অত সদ্দারী করতে, ভালো বলা হয় বলে আর অহঙ্কার ধরছে না।

নন্দ মুখ কাল করে মিলির দিকে তাকালো। মিলি তখনও বলে চলেছে।

ছোটরা মায়ের কানে কথাটা পৌঁছে দিতে একটুও দেরী করেনি। আবার এক পশলা হয়ে গেল মিলির উপর।

পাশের ঘর থেকে মিলি শুনতে পেলো, মা বাবাকে বলছেন—মেয়ে নিয়ে খুব ভুগতে হবে, নন্দ এসে অবধি ও যা খারাপ ব্যবহার করছে তার কথা নেই। ভালো স্কুলে মেয়ে পড়াতে দিয়েছ—এই কি সেখানকার গুণ?

স্কুলের দোষ কি বল? মেয়েকে ডেকে ভাল করে বল, ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা আমি বলছি। মিলি, ও মিলি—শোন এদিকে!

মিলি আসতে বাবাকে থামিয়ে মা বললেন,—আজ রাত্তিরে বসে তোমায় দশখানা বিজয়ার চিঠি লিখে ফেলবে। সকালেই পোস্ট হবে। কাকে কাকে লিখতে হবে লিখে দিয়েছি। নন্দর কাছে আছে। সেও লিখবে, চেয়ে নিও।

বাবার কাছে বকুনী খেতে হলো না বলে বেশ ভাল লাগছে, তাহলে চট করে চিঠিগুলো লিখে ফেলি—এই ভেবে সে নন্দর কাছে গেল। নন্দ একমনে লিখে চলেছে। হাতের লেখা কী সুন্দর।

মিলি বললে,—নন্দদা, দাও কি লিস্ট আছে। তারপর নিজের পড়বার টেবিলে গিয়ে বসে লিখতে আরম্ভ করলো।

রাত অনেক হয়েছে, শেষ হচ্ছে না, ঘুম চোখে জড়িয়ে আসছে। এমন সময় নন্দ এসে বললে,—মাসীমা বললেন, চিঠিগুলো দাও, সব এক সঙ্গে পোস্ট করা হবে।

—কে করবে, তুমি?

নন্দ বললে,—তা করতে পারি।

—হুঁ, অত আর কাজ করতে হবে না। রেখে দাও, আমি পোস্ট করবো।

নন্দ তার ভাগের দশখানি চিঠি টেবিলের উপর রেখে নিঃশব্দে চলে গেল।

তার ও নন্দর সব চিঠিগুলি তুলে নিয়ে দু'ভাগে দু'টো ড্রয়ারে রেখে দিল ভিতর দিকে ঠেলে।

হঠাৎ যেন মিলির চোখের ঘুম চলে গেল। চোখ বড় করে কি ভাবলে। তারপর কপাল কুঁচকে বলে উঠলো—'দেখাচ্ছি'।

পরের দিন বাড়িতে অনেক লোকজন এসেছেন বিজয়া করতে। মিলি কোনদিকে না চেয়ে হাত বাড়িয়ে ড্রয়ার থেকে চিঠিগুলো নিয়ে রাস্তার লেটার বক্সে ফেলে এলো।

মনে মনে আবার একটু হাসলো, ভাবলো, কেমন জব্দ, তোমার চিঠি রইলো পড়ে।

বেশ কয়েকদিন পরে বাড়িতে অনেক চিঠি আসছে। দিদু, ছোট মাসী—ন' মামা, রাঙাদি, সোনাদা সবার চিঠি। বিজয়ার প্রীতি প্রণামে ভরা—আর অনুযোগ করা—মিলি কি একটুও লিখতে পারে না—কেমন আছে সে?

মা চিঠি পড়ে শোনান আর বলেন,—চিঠি কি লিখেছিলে?

—হ্যাঁ মা, সত্যি লিখেছি, নিজে পোস্ট করেছি।

—নন্দকে তো সবাই উত্তর দিচ্ছেন—তুমি যেন কি!

মিলি কি ভাবলো, তারপর চলে গেল নিজের পড়ার টেবিলে। প্রথম ড্রয়ারে কিছু নেই। কই ঠিকই তো হয়েছে, ডান দিকে তারগুলো ছিল আর বাঁ দিকের ড্রয়ারে নন্দদার। বাঁ দিকের ড্রয়ার টানতেই—খাম সমেত চিঠির গোছা বেরিয়ে এলো। হ্যাঁ, এই তো, এগুলো ছেঁড়া হয়নি—এখন ছিঁড়ে ফেলি।

গোছা তুলে নিয়ে ছিঁড়তে যাবার আগে মিলি ভাল করে তাকিয়ে দেখলো—চিঠিগুলো সব তারই লেখা! যেগুলি তার মনে করে সে তাড়াতাড়ি পোস্ট করে এসেছিল সেগুলো নন্দর লেখা চিঠি।

চিঠিগুলো হাতে করে মিলি অনেকক্ষণ বসে রইল তারপর ভাবলো, দিদু ঠিকই বলেন—'পরের মন্দ করতে গেলে নিজের মন্দই আগে হয়।'

নাঃ আর সে এমন করবে না কখনও।



ডাইনী

মা-বাবা যতই বলুন সিতু কিছুতেই শুনবে না। লালু মামাকে দেখতে সে যাবেই। বেচারী এতদিন ধরে ভুগছেন আর কাছে কেউ নেই। কত দুঃখ করে চিঠি লিখেছেন অথচ মার নিজের সহোদর ভাই, মা বলছেন কিনা—কে যাবে বুঝতে পারছি না। বাবা বলছেন, তাই তো, কি যে করা যায়!

সিতু ভাবছে—কে যাবে বুঝতে পারছি না, আর তাই তো কি করা যায়—এসব কথা বলার সময় আছে নাকি? টেলিগ্রামটা সেই তো সই করে নিয়েছে, আর সেই পড়ে শুনিয়েছে ভিতরের কথা। তখন থেকে সিতু ভাবছে একাই চলে গেলে হতো। কারণ, এত ভাবাভাবি করতে গেলে কাজ কম হয়। চিন্তাটা বেশি হয়ে যায়। কিন্তু যদি কিছু বলতে যায়, তাহলেই হবে ছেলেমানুষ, মেয়েমানুষ। ঐ কথাটা শুনলেই তো সিতুর হাড়পিত্তি জ্বলে ওঠে। স্কুল ফাইনালের আসন্ন পরীক্ষার জন্য সে তৈরী হয়েছে, সে কোন্ আক্কেলে ছেলেমানুষ হবে? এ নিয়ে মার অন্তঃপুর রাজত্বে মহা সোরগোল বেধে গেছে। এই দু'টি কারণেই তার নাকি যাওয়া হতে পারে না।

বাবার কাছে দরবার করতেই বাবা খুশি হয়েই বললেন: 'বাঃ, সে বেশ হবে সিতু। সম্ভব হলে মামাকে নিয়ে চলে এসো।'

মা একবার রাগ করে বললেন: মেয়েকে এত আস্কারা দিতে তোমার মত আর কেউ পারে না।

বাবা বললেন: আস্কারা? কি যে বল? ভেবেই পাচ্ছিলাম না কি করা যায়। সিতু আমায় বাঁচালে। তোমার ভাই-এর জন্য তোমার তো নিজেই যাওয়া উচিত।

মুখ ভারী করে মা বললেন: সে ইচ্ছা থাকলেই কি হবার যো আছে তোমাদের সংসারের জন্য?

সিতু বললে: না বাবা, মাকে যেতে হবে না, এখনি বলবেন রীতুর কলেজ, মিতুর পরীক্ষা, ইতু মাকে ছেড়ে ঘুমুতে পারে না—তার চেয়ে আমি আজই দুপুরের গাড়ীতে চলে যাই।

সদাশিব বাবা মেয়ের সঙ্গে একমত হয়ে বলে ওঠেন: 'হ্যাঁ, হ্যাঁ সেই ভালো। মার কাছে থেকে বেশি করে টাকা নিও, আর কম্বল। দেখছো না কি ঠাণ্ডা!'

সিতু এসে পৌঁছলো তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে। মুঠো মুঠো করে কে যেন বরফের গোলা ছুঁড়ছে। গায়ে অতবড় একটা কোট, তবু যেন মনে হয় ঠিক হচ্ছে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই নির্দিষ্ট বাড়ীর দরজায় এসে টোকা দিতেই একজন পরিচারিকা দরজা খুলে দিয়ে বললে: তুমি তো এই বাড়ীতে এসেছ, ভাল্লো হলো—আমি বাড়ী যেতে পাচ্ছি না। বাবু কিছুতেই ছাড়ছেন না। খুব কষ্ট হচ্ছে—জ্বরও রয়েছে। আমি এবার যাই। কী রকম ঠাণ্ডা, বাড়ী যাবো কি করে যে তাই ভাবছি। দিন থাকতে থাকতে গেলে হতো।

সিতু বললে: নাই বা গেলে। আমি তো এসেছি। দু'জনে থাকবো চল।

—বাড়ীতে আমার কাচ্চাবাচ্চা আছে না। তা যাই হোক তুমি ভিতরে যাও, আমি চললাম।

সিতু আর কি করবে—দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গিয়ে বন্ধ করে দিল। ইস্, লালুমামা যন্ত্রণায় ছটফট করছেন—আর ঘরটা কি

অপরিষ্কার। ঐ কাজের লোকটি করছিল কি?

সিতু হাতের স্যুটকেশ রেখে কোট খুলে ঝুলিয়ে রাখলো। তারপর বিছানার কাছে গিয়ে বললে: লালুমামা, কেমন আছ, আমি এসেছি। মা পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি সীতা, সিতু—

—জ্বরতপ্ত কপালে হাত দিতেই লালুমামা চোখ তুলে তাকালেন—আঃ বাঁচলাম সিতু! কিন্তু তোর কষ্ট হবে যে—

—তুমি কিছু ভেবো না লালুমামা। এই দেখ কালই তোমার জ্বর ছেড়ে যাবে।

আধঘণ্টার মধ্যে সিতু ঘর, বিছানা সব গুছিয়ে পরিষ্কার করে ফেললে। একটু আগের ঘরই যেন নয়। তারপর রোগীর জন্য যা যা করবার করে নিজে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

বেশ অনেকক্ষণ কেটে গেছে—আরাম পেয়ে লালুমামা ঘুমিয়ে পড়েছেন আর তাঁর চোখও ভারী হয়ে আসছে। রোগীর খাবার কিছু আছে কিনা, নিজেও কিছু খেতে হবে—এই ভেবে পাশের ঘরে গেল—খাবার-দাবার তো মোটামুটি আছে। কিন্তু ঝি-টা দরজা জানলাও বন্ধ করেনি—হু-হু করে হিম ঢুকছে, সব কনকনে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। জানলাটা বন্ধ করতে গিয়ে সিতুর মনে হলো কে যেন কাঁদছে। কাউকেও তো দেখা যায় না—তবে? জানলা বন্ধ করে সদর দরজাটা খুলতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা তার চোখমুখে ছড়িয়ে পড়লো। ইস্ কী ঠাণ্ডা! আর কিছুই যেন দেখা যায় না। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলো, তারপর তার মনে হলো—কে যেন আসছে!

হ্যাঁ আসছেই তো। কাছে এসে গেল সে। একজন মেয়ে। মুখ শুকিয়ে গেছে, মাথার চুলে কতদিন তেলজল পড়েনি। ধুলোময়লা লেগে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে, শতছিন্ন কাপড়, গায়ের জামার অর্ধেকটা নেই। চোখ সাদা হয়ে গেছে, ভীতি-বিবর্ণ মুখে এসে দাঁড়ালো সিতুর কাছাকাছি। সিতু প্রথমটা ভয় পেয়ে গেছে—অন্ধকারও দারুণ হিমের মধ্যে থেকে কে উঠে এলো যেন প্রেতাত্মার মত। তবু মনে সাহস এনে সিতু বললে: কে তুমি? কি চাও?'

—উঃ, আমি আর পারছি না—বলেই সে বসে পড়লো। সিতু বললে: ওঃ, তুমি মানুষ। তাহলে ঘরে এসো। কোনরকমে উঠে

এলো সে। মামার ঘুম ভেঙে যাবে বলে সিতু তাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল—বললে : বলো, কে তুমি ?

—আগে আমায় খেতে দাও কিছু।

এদিক-ওদিক দেখে রুটি-বিস্কুট, জ্যাম-জেলী, মুড়ি-চিঁড়ের ঢাকা খুলে কিছু খাবার তাকে দিল। কিন্তু খেতেই পারছে না সে, আটকে যাচ্ছে তার মুখ—চোখ দু'টো ঠেলে বেরিয়ে আসছে যেন।

—একটু গরম কিছু খাবে ? দাঁড়াও চা করে দিই। মেয়েটি সিতুর দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন এ-ধরণের কথা কোনো-দিন সে শোনেনি।

খাওয়ার পর সেইখানেই একটা চাদর কম্বল দিয়ে সিতু বললে : তুমি শোও।

মামার বিছানার একপাশে গুটিসুটি হয়ে সিতু বসে রইল আর ভাবছিল—ও কে হতে পারে ? চোর ছেঁচোর নয় তো ? অর্ধেক রাতে উঠে দেখবে না তো সব চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে। এবার সিতুর ভয় হলো, আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলো : মেয়েটি চাদরের উপর শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে—হাত-পাগুলো গুটিয়ে পেটের কাছে নিয়ে এসেছে।

—'বাকী রাত জেগেই কাটিয়ে দেবো—চোর হলেও কিছু করতে পারবে না।' মনে মনে একথা ভেবে সিতু আবার মামার বিছানার কাছে এসে বসলো। কিন্তু কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে সে, তা জানেই না। যখন ঘুম ভাঙলো, দেখে জানলা দিয়ে সকালের আলো মুঠো মুঠো এসে পড়েছে বিছানায়—ইস কত দেরী হয়ে গেল, যাক মামা এখনও ঘুমোচ্ছেন—এখনি ওঁর জন্য সব তৈরী করতে হবে। মনে মনে ভাবলো সিতু—তারপর কাল রাতের কথা মনে পড়লো। তাড়া-তাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে দেখে মেয়েটি বসে আছে। আর অপরিষ্কার ঘরদোর সব পরিচ্ছন্ন করে নিজেও যথাসম্ভব পরিষ্কার হয়ে আছে।

—ওঃ তুমি উঠে পড়েছ। আচ্ছা অন্য কথা পরে হবে, খানিকটা গরম জল চাই এখনি।

সিতুর কথা শেষ হবার আগেই মেয়েটি আঙুল দিয়ে দেখালো। গরমজল, চা, দুধ সব তৈরী হয়ে সাজানো রয়েছে।

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকালো সিতু! তারপর লালুমামার পরিচর্যায় লেগে গেল। মুখ ধোয়ানো, বিছানা বদলান, জ্বর দেখা, ওষুধ খাওয়ানো—তারপর দুধ দিতেই—মামা বললেনঃ কি করেছ সিতু, দিদি দেখি তোমায় একেবারে গিন্নি বানিয়েছে। এটুকু সময়ের মধ্যে এত সব?—আমায় সাহায্য না করলে পারতুম না, তোমার ঝি কাল আমায় দেখে সেই চলে গেল আর এলো না।

—তবে সাহায্য করলো কে?

—ঐ যে! শোনো ভাই এদিকে এসো তো।

মামা তার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেনঃ সর্বনাশ,—করেছ কি সিতু, ওতো একটা ডাইনী, বেশ ক'দিন থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে আশে-পাশে—সবাই বলে দিনে দেখা যায় না, রাতের দিকে বেরোয়, অন্ধকারে—ওর চোখের তাকানো—উঃ সাংঘাতিক! শীগ্‌গীর বিদায় করো ওকে, নাহলে আমার অসুখ তো ভালই হবে না, বেড়ে যাবে। বিশ্বাস না হয় এবাড়ী-ওবাড়ী জিজ্ঞাসা করো।

সিতু কেমন থমকে গেল—তবু মনে সাহস এনে বললে, আচ্ছা তুমি ও ঘরে বসো তো একটু।

মেয়েটি অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকিয়ে চলে গেল।

মামা বললেনঃ শীগ্‌গীর এখনি বিদেয় কর, ডাইনী—ও নির্ঘাত ডাইনী।

—আচ্ছা মামা তা করছি, কিন্তু ওকে জিজ্ঞাসা করি না ও কে, কোথা থেকে এসেছে?

মামা জোরে ঘাড় নেড়ে বললেনঃ কি হবে পাড়ায় জিজ্ঞাসা কর সবাই জানে, সন্ধ্যার অন্ধকারে আজ সাত-আট দিন ওকে দেখা যাচ্ছে, দিনের বেলা কোথায় থাকে—বলতে বলতে মামা হাঁফিয়ে উঠলেন।

—তুমি শুয়ে পড়ো আমি দেখছি।

—মামা সেই যে ঢাকা দিয়ে শুলেন—একেবারে ১০৪ জ্বর। সিতুও এবার একটু ভয় পেয়েছে কিন্তু তবু ঐ মেয়েটিকে ওর খুব খারাপ লাগেনি। স্নান করে তাকে অনেক স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। তাছাড়া ওকে দিয়ে অনেক সাহায্য হচ্ছে, এখনি তাড়িয়ে দেওয়া হবে না।

—ঠক ! ঠক ! ঠক ! দরজার শব্দ হতে সিতু গিয়ে খুললে। তিন-চারটি বেশ বড় ছেলে দাঁড়িয়ে বলছে ঃ এই বাড়ীতে সেই ডাইনীটা এসেছে ?

—ডাইনী কে ? এখানে কেউ আসেনি। আমার মামার অসুখ আমি কোলকাতা থেকে এসেছি। বিরক্ত করবেন না, মামার জ্বর বেড়ে যাবে।

সকালেই তারা এসে পেঁ ৗছল বাড়ীতে। ভাই-এর অবস্থা দেখে মাতো খুব ভয় পেলেন। বাবা সিতুকে আদর করলেন, বললেন ঃ দেখো মেয়ের মত মেয়ে আমার সীতা, কেমন করে রুগ্ন মামাকে নিয়ে এসেছে। একরত্তি ছোট্ট মেয়ে।—না বাবা, না—ঐ যে আমার সাহায্যকারী।

—কে তুমি মা ?

বাবার কথার উত্তরে ছল ছল চোখে মেয়েটি বল্লে ঃ পরিচয় তো আছে, কিন্তু এখন আমার নাম ডাইনী !

—সে কি ! সে কি ! ভাল মানুষ বাবা কেমন হয়ে পড়ছেন। সিতু বললে ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়নি। মা মামার কাছ থেকে আসুন তখন জিজ্ঞাসা করো। মেয়েটি বললে ঃ আপনার এই মেয়েটি না থাকলে পরশু রাতেই আমি মরে যেতাম। এখন আমি মানুষের মত মানুষ দেখতে পাচ্ছি। মনে করতে পারি না সব কথা, পড়া শেষ করে আসছিলাম সন্ধ্যাবেলা, রাস্তায় বেশি লোকজন ছিল না, গ্যাসের আলো মিটমিট করছিল—তিন চারটা লোক সামনে এসে দাঁড়ালো, একটা আমার মুখের উপর কি চেপে ধরলো—আর একটা আমার কান হাত গলা থেকে বোধহয় গয়নাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিচ্ছিল তারপর আর কিছু জানি না। যখন তাকালাম দেখলাম একটা ভাঙা বাড়ীর মধ্যে পড়ে আছি, গায়ে একটুও শক্তি নেই। কিছু চিনি না। বেরিয়ে এসে দেখলাম একেবারে অন্য জায়গা কোথায় যাবো, কি করবো ভেবে আবার সেই বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেলাম—কাপড় জামা ছিঁড়ে গেছে, বইখাতা পয়সা গহনা কিছু নেই, কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ছিলাম আবার যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন সন্ধ্যা। ক্খিদেয় মরে যাচ্ছি। রাস্তায় বেরিয়ে দেখি ছেলের দল

খেলা করছে। আমার বিচ্ছিরী চেহারা দেখে তারা বলে উঠলো ঃ ওরে দেখ, ঐ একটা ডাইনী। ইঁট মারতে লাগলো।

যেদিন যখন বেরিয়েছি, ছোট বড় সব লোক ঐরকম করেছে। আবার সেখানে গিয়ে ঢুকেছি। ক'দিন ওরকম কেটেছে জানি না। সেদিন ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে যাচ্ছিলাম—যা হয় হবে বলে ছুটেছিলাম—তারপরের ঘটনা ওকে জিজ্ঞাসা করুন।

সিতু এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে ওর মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। ভাবলো ঃ ভাগ্যি আমি তাড়িয়ে দিইনি।'

মা-বাবা ভাই-বোনেরা সবাই অবাক। খবর দেওয়ার পর ললিতার বাবা-মা এলেন। প্রায় পনের দিন পর মেয়েকে ফিরে পেলেন তাঁরা। কান্নাতে হাসিতে তাদের চোখ মুখ ভরা।

লালুমামা ভাল হয়ে গিয়ে সব শুনে বললেন ঃ তাহলে তো সিতু খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। ডাইনী বলে সবাই ওকে তাড়া করেছিল, এমনকি আমিও—মরেই যেতাম। নাঃ সিতুর জন্য একটা বড় কিছু করার দরকার।

সেদিন বাড়ীতে বিরাট ভোজ। বাবা, লালুমামা, ললিতার বাবা সকলের দেওয়া উপহারের মধ্যে সিতু বসে ললিতার সঙ্গে গল্প করছে।

একটা বিরাট পার্শেল হাতে করে একজন লোক এলো, সীতা চৌধুরীকে খুঁজছে।

সিতুর অনন্যসাধারণ বুদ্ধিমত্তার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ একটি সার্টিফিকেট ও একটা উপহার পাঠিয়েছেন।



ইচ্ছা করে যাই

কতদিন থেকে বাড়ীটা খালি পড়ে আছে। একেবারে পাশের বাড়ী রিণ্টুদের। তাই রিণ্টু মনে মনে ভাবতো—বাড়ীটায় ভাড়া আসে না বা যাদের বাড়ী তারাও আসে না, কিন্তু যদি আসতো বেশ হতো, তার মত ছেলেমেয়ে থাকলে বন্ধুত্ব হতো, বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে এসে খেলবার সাথী খুঁজতে সেই মোড়ের মাথায় পাপিয়াদের বাড়ী যেতে হতো না।

মাও তো বলেন রিণ্টু শুনেছেঃ কী বাপু খালি বাড়ী আর কতদিন রাখবে, কোনদিন কে ঢুকে পড়বে তখন বুঝবে। বাড়ীওয়ালা কি আজকালকার ব্যাপার কিছু বোঝে না?

কেউ যদি ঢুকে পড়ে আর তাদের যদি ছোট ছেলেমেয়ে থাকে, তাহলে আর কেউ না হোক রিণ্টুতো বাঁচে, একটা বন্ধু হয়। রোজ রোজ রাস্তা পার হয়ে মোড়ের কাছে যেতে ভাল লাগে না—আবার না গেলে বিকেলটা একটুও খেলাধুলো হয় না। বিকেলে ছুটে ছুটে না খেলে কি শুধু খেলনা-বাটি নিয়ে খেলতে ভালো লাগে?

রিণ্টু তাই রোজই তাকিয়ে থাকে সতৃষ্ণ নয়নে—বাড়ীটার দিকে। কিন্তু বন্ধ দরজা জানালা একভাবেই থাকে—খোলে না।

তাই যদি বিকেলবেলা পাপিয়াদের বাড়ী না যাওয়া হয়, সেদিন ঘাড় হেঁট করে বসে ঘরের ভিতর খেলতে হয়। ঐদিকে রিণ্টু আর তাকায় না—কারণ ইচ্ছা হলেও তো যাওয়া হবে না।

শোবার ঘরে খাটের রুজু রুজু যে জানলা সেটা খুললেই পাশের বন্ধ বাড়ীটার একটা জানলা ঠিক সামনেই দেখা যায়। এই জানলার দিকে তাকিয়ে কতদিন ভেবেছেঃ কোনদিন সকালে উঠে সে যদি দেখতে পেতো ঐ জানলাটি খুলে গেছে, আর রিণ্টুর মত একটা মেয়ে কিংবা ববির মত একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে—ইস্, কী মজাই না হতো!

কিন্তু অনেক দিন অনেকবার ভেবেছে রিণ্টু আর সব ভাবনাগুলো এমন বিফল হয়েছে যে সে রাগ করে বিরক্ত হয়ে ঐ জানলাটা একদম বন্ধ করে দিয়েছে। মা যদি জানলা খুলে দেন ও অমনি গিয়ে ধড়াস করে বন্ধ করে দেয়। মাঝে মাঝে রেগে ওঠেনঃ ওটা কি হচ্ছে রিণ্টু, ঘরে কি হাওয়া-বাতাস আসবে না? কি ভেবেছ তুমি?

—আমি যখন স্কুলে যাবো তখন তুমি খুলে দিও, বড্ড চোখে লাগে আমার, বেশি আলো আসে।

—মেয়ের সব বিচ্ছিরী, আলো-বাতাসের জন্য মানুষ মরছে, আর ওর নাকি চোখে আলো লাগছে—বলতে বলতে মা নিজের কাজে যান।

জানলাটা বন্ধই থাকে।

মনের দুঃখ যখন সহ্য হয়ে এসেছে এমন সময় একদিন রাত্রে রিণ্টু স্বপ্ন দেখলো—বন্ধ জানলাটা কে যেন খুলে দিয়েছে, আর পাশের বাড়ীর জানলাটাও খুলে গেছে। ঘরটা বেশ দেখা যাচ্ছে, সাজসজ্জার বাহুল্য অনেক, আর তার মত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেন ভিড় করে খেলছে, ফুঁ দিয়ে ফানুস ওড়াচ্ছে! জলের কৌটার মত সার বেঁধে উপর দিকে উঠছে—একটা ছেলে শিশি থেকে কি যেন নিয়ে গাল ফুলিয়ে ওড়াচ্ছে—কমলালেবু, আপেল, বিস্কুট, চকোলেট নিয়ে ছুঁড়ছে ধরছে—ভালো জামাকাপড় পরেছে সবাই, বেলুন ওড়াচ্ছে—বাঁশী বাজাচ্চে, চুলে রিবন বাঁধা মেয়েগুলো কেমন ইংরেজি সুরে মাঝে মাঝে গান করছে।

কী অসম্ভব কাণ্ডই না চোখের সামনে ঘটছে।

এতকালের বন্ধ বাড়ীটায় কখনই বা লোকজন এলো, কখনই বা এমন আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা হলো—কিছুই তো বুঝতে পারছে না রিন্টু। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে, মনে ভাবছে এইরকম উৎসব বড়দিনের সময় সে মিসেস ওয়াটলিং-এর বাড়ী দেখেছে। মার বন্ধু আন্টি ওয়াটলিং—বড়দিনে সব্বাইকে নেমন্তন করেন। মার সঙ্গেও গেছে, আবার মা যখন যেতে পারেন নি—কার্ড আর ফুল নিয়ে সে নিজে গেছে আর ঐ ছোটদের দলে মিশে গেছে।

এইরকম আলো-ঝলমলে বড়দিন বেশ লাগে রিন্টুর। কেকের স্বাদটাও ভালো। সাহেব পাড়ার সিনেমা হাউসে ছবি দেখতে গেলেই সে বড়দিনের উৎসবের গন্ধ পায়।

কিন্তু ওরা এলো কখন আর ব্যবস্থাই বা হলো কি করে। স্কুল যাবার সময়ও সে দেখেছে বন্ধ বাড়ীর গায়ের মস্ত তালাটা।

ওমা! ওরা যে তার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলছে? ঐ দেখ মেয়েটা এখনও শুয়ে আছে।

সার্কাসের ক্লাউনের মত সাজ সেজে যে ছেলেটা তার দিকে চেয়ে হাসছে, ওকে কোনদিন দেখেছে বলে তো রিন্টু মনে করতে পারে না। তবু ভদ্রতা করে একটু হাসতেই হয়। জানলাটা কে যে খুলে দিল, একেবারে খাটের সামনে ওদের দেখা যাচ্ছে কি করি, জানলাটা বন্ধই বা করি কি করে?

ওদের হাসাহাসি,—মাঝে মাঝে হাত নেড়ে ডাকাডাকি একটুও থামছে না।

কিন্তু এ আবার কি একরাশ অন্ধকার! চোখ দু'টো রগড়ে নিলো রিন্টু—নাঃ, লোকজন আলো ফুল বেলুন কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

রিন্টু, ওঠো ওঠো আর কতক্ষণ ঘুমোবে? মায়ের কথা শুনে উঠে পড়লো। চারিদিক তাকিয়ে সামনের বন্ধ জানলাটা খুলে দিল। রাত্রির কথা মনে হতে সে ভাল করে তাকালো।

নাঃ, তেমনি বন্ধ! অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে রিন্টু উঠে গেল। সারাদিন ভারী খারাপ কাটলো। মাঝে মাঝে রাত্রির স্বপ্নর কথা মনে হচ্ছে আর অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে।

স্কুলের দিদি ক্লাসে বললেনঃ আজ তোমার কি হয়েছে? অমনি সব সহপাঠিনীরা তার দিকে তাকিয়ে হাসলো। লজ্জায় রিণ্টুর মুখ লাল হয়ে উঠলো।

বিকেলে বাড়ী এসে কোনদিকে না তাকিয়ে ঝুপ করে বইপত্তর ফেলে বিছানায় শুয়ে পড়লো। সামনের জানালা বন্ধ হয়নি। আর ওকি? ওদের বাড়ীর জানলাটাও যে খোলা। মাথাটা তুলতেই দেখলো একজন রাজমিস্ত্রী বালতিসুদ্ধ চুন গোলা নিয়ে ঘোরা-ফেরা করছে।

তাহলে? নাঃ, রিণ্টু আর ভাববে না। এইজন্য সব সময় তাকে বকুনী খেতে হয়। আর না!

কিন্তু বাড়ীটা কবেই বা রং ফেরানো হলো?

স্কুল থেকে ফিরে রিণ্টু আগে গিয়ে ছুটলো তাদের জানলার কাছে। ঝটাক শব্দ করে খুলে দিলো জানলাটা। এখন সে ভাল করে দেখবে ব্যাপারটা কি! হ্যাঁ, ও-বাড়ীর জানলা বন্ধ, কিন্তু কই লোকজন কিছু দেখা যাচ্ছে না। অনেক চেষ্টা করেও কারুর সাড়া শব্দ পেলো না। খাবার খেতে খেতে বললেঃ ও-বাড়ীটায় কবে লোক এসেছে মা, কবেই বা রং করেছে?

মা বললেনঃ তুমি তো জানলা খুলতে দেবে না, কি করে জানবো বল? কিছুদিন থেকে মিস্ত্রী কাজ করছিল, কি জানি কারা এসেছে কিনা।

আবার উৎসাহ নিয়ে রিণ্টু চেষ্টা করে, কেউ আছে কিনা দেখতে, কিন্তু কিছুই তো দেখা যায় না। একদিন রাগ করে বলে উঠলোঃ দূর ছাই ভুতের বাড়ী, ওতে আবার লোক থাকে নাকি। ভুতরা থাকে, তারাই এসেছে, তাই দেখা যায় না। যদি কোনোদিন কাউকে দেখতে পাই এমন জিব ভেঙাবো, তখন বুঝতে পারবে ওরা। আর সাতজন্মে ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবো না, অমন বন্ধু চাই না!

ভাবতে ভাবতে রাগে দুঃখে রিণ্টুর চোখে জল এসে গেল। কতদিন ধরে ভাবছে, ভাবছে আর ভাবছে—কিন্তু বন্ধ বাড়ী আর খোলে না। ওদিকে তাকিয়ে চোখ দু'টো ব্যথা হয়ে গেল যে। আর তাকাবেই না।

তবু দেখে—মনে মনে যতই বলুক চোখ যায়—তারপর ভাবেঃ বন্ধ তো থাকবেই, কেন যে চোখ যায়! একদিন তপু আর ঝণ্টুকে বলবো ওদের সদর দরজায় এক জোড়া ভূত-পেত্নী এঁকে দিয়ে আসতে। আমার মত সকলেই বুঝে নেবে ওটা মানুষ থাকার বাড়ী নয়। তা যদি হতো তাহলে এতদিন জানলা খুলে যেতো। এর জন্য হয়তো তপু আর ঝণ্টুকে পাল্তা বরফ, আলুকাবলী, আর ঝাল ছোলা খাওয়াতে হবে। আর এই জন্য মায়ের কাছে আবার দরবার করতে হবে, তু'টো টাকা তো চাইই।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরেই খেলতে গিয়ে তপু আর ঝণ্টুকে মনের কথাটা বলে ফেললে। তপু আর ঝণ্টু সেরা ছেলে, তার মানে তুষ্টুমিতে তাদের একজোড়ার মত আর দেখা যায় না।

কিছুতেই রাজী হয় না তারা, বলেঃ দূর ওসব ছেলেমানুষী, কেন না ভূত-পেত্নী এঁকে নোংরা হবে আর তো কিছু নয়।

রিণ্টু বললেঃ তা হোক, ওদের দরজা ময়লা হবে তাতে আমাদের কি!

আর ময়লা করেই বা আমাদের লাভ কি? ঝণ্টু উত্তর দিলে।

ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো রিণ্টুঃ আহা, সবই যেন তোরা ভেবে-চিন্তে করিস,—ভারী সাধু সাজা হচ্ছে দেখছি।

অবশেষে তাদের রাজী করানো হলো, পাল্তা বরফ, আলুকাবলীর ব্যবস্থায়।

দেখবো না মনে করেও বারে বারেই যেন চোখ ওদিকে যাচ্ছে। জানলাটা কিছুতেই খুলতে দেবে না রিণ্টু মাকে। তার মনের রাগ কেটে গেলে তখন সে যা হয় করবে। সেদিন মাকে গিয়ে সোজা বললেঃ তু'টো টাকা দাও না মা!

কেন? একেবারে তু'টো টাকা? বন্ধুদের বইটই নিয়ে হারিয়ে ফেলেছ বুঝি? কিনে দিতে হবে? না কারুর জন্মদিন? মার প্রশ্নের উত্তরে রিণ্টু বললেঃ না একটাও না। আমার একটা কাজ করে দেবে তপু আর ঝণ্টু। তাই ওদের খাওয়াতে হবে।

কাজ? তোমার কি কাজ থাকতে পারে এমন যার জন্য টাকা দিয়ে খাওয়াতে হবে? কাল বিকেলে খেলতে এলে ডেকো, আমি

খাইয়ে দেবো।

রিণ্টু তাড়াতাড়ি বলে উঠলো ঃ ওরা বুঝি ঐসব খাবে ? লুচি পরোটা নয়, আলু চচ্চড়ি আর আলুর দমও নয়, যে তুমি খাওয়াবে। ওরা যা খাবে তা তোমার পছন্দই হবে না। দাও না মা, মোটে তো ত্ব'টো টাকা চাইছি, তাও দিচ্ছ না।

মা হেসে ফেলে বললেন ঃ আচ্ছা আচ্ছা দেবো। কিন্তু তোমার কাজটা কি ?

সে তোমার জেনে কি হবে ? পরে বলবো অখন।

মায়ের কাছ থেকে ত্ব'টো টাকা নিয়ে রিণ্টু ছুটলো পাত্মা বরফ আর আলুকাবলীর খোঁজে। পেট ভরে ওদের খাওয়াতে হবে। ওদের ত্ব'জনকে এত তাড়াতাড়ি রাজী করানো গেছে মনে করে খুব খুসী হয়ে উঠলো সে।

বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে, সন্ধ্যা নেমেছে।

হঠাৎ বেশ চেঁচামেচি গোলমালের একটা শব্দ কানে আসতেই রিণ্টু বারান্দায় বেরিয়ে দেখলো—তপু আর ঝণ্টুর হাত ধরে একজন ভদ্রলোক খুব বকছেন ঃ তোমরা ভদ্রলোকের ছেলে না ? স্কুলে পড়ো না ? একি অভ্যাস তোমাদের, নতুন রং-করা দরজা-জানলা, এইরকম ভাবে এসে কালো কালো রং দিয়ে কি হিজিবিজি কাটছো ? কোথায় তোমাদের বাড়ী ? চলো তো যাই তোমাদের বাবা-মার কাছে।

আটকে আটকে তপু বললে ঃ ঐ যে আমাদের বন্ধু রিণ্টু—সে বলেছিল—।

সে কি বলেছিল আমাদের বাড়ীর দরজায় নতুন রঙের উপর এইসব নোংরা করতে ?

রিণ্টু ভয়ে পালিয়ে এলো ঘরের মধ্যে, এখনি ওরা ওর নাম বলে দেবে আর মা বাবার কাছে বকুনি খেতে হবে। মা আবার যে রকম পরিষ্কার ! দেয়ালে ঠেস দিতে দেন না, চেয়ারের গায়ে মাথা রাখতে দেন না তেল লাগবে বলে, কত কি করতে দেন না—লোকের বাড়ী নোংরা করবার বুদ্ধি দিয়েছি শুনলে তাকে আর আস্ত রাখবেন না !

রিণ্টুর বুক টিপটিপ করতে লাগলো।

বাইরে তখনও সেই বকাবকির শব্দ আসছে। কতক্ষণ কেটে গেছে রিণ্টু মনে করতে পারে না।

আর কোন সাড়াশব্দ নেই বাইরে থেকে। মার কথাও শোনা যাচ্ছে না, বোধহয় কোথাও বেরিয়েছেন।

রিণ্টু বন্ধ জানলাটার ছিটকিনিতে টান দিল। শব্দ করে জানলাটা খুলে গেল!

ওমা একি! ও-বাড়ীটার দরজা-জানলা সব খোলা, নতুন কাপড়ের পর্দাগুলো উড়ছে, ঘরের নতুন আসবাবপত্র চোখে পড়ছে, নিয়নের আলোয় ঘর ভরে গেছে।

খাবার টেবিল পাতা আছে পাশের ঘরটায়, কোণাকুণি হয়ে দেখা যাচ্ছে, কারা যেন বসে আছে। বোধহয় খাচ্ছে।

রিণ্টু এত অবাক হয়ে গেছে যে আর কিছুই ভাবতে পাচ্ছে না— কি হলো, কেমন করে হলো?

এদিকের জানলার দিকে তাকাতেই রিণ্টুর মত একটি সুন্দর মেয়ে হাসছে দেখতে পেলো। রিণ্টু সেদিকে তাকাতেই বলে উঠলো : আমি রুবি, আজ আমরা আমাদের এই বাড়ীতে এসেছি। তোমার বন্ধু তপু আর ঝণ্টু, ঐ দেখ এসেছে আমাদের বাড়ীতে। তুমিও এসো।

রিণ্টুর মুখ দিয়ে কথা আসছে না। রুবি বললে : ছোটকাকা ওদের খুব বকছিলেন—সদর দরজায় আলকাতারা দিয়ে ছবি আঁকছিল। ওরা বললে তুমি…

রিণ্টু আর শুনতে পাচ্ছে না। ইস্ কী লজ্জা! কেন যে সে এমন কাজ করতে গিয়েছিল। ভয়ে লজ্জায় চোখ তুলে আবার যখন তাকালো তখন রুবি বলছে : এসো রিণ্টু, আমরা তোমার জন্য বসে আছি, একসঙ্গে খাবো।

আলনা থেকে একটা জামা নিয়ে মাথা দিয়ে গলাতে গলাতে সিঁড়ি থেকে রিণ্টু চেঁচিয়ে বললে : মা আমি একটু পাশের বাড়া থেকে আসছি। আমার বন্ধু এসেছে।



বেডারের কথা

মিষ্টুর কুকুর বাচ্চাটাকে দেখলেই আদর করতে ইচ্ছা করে। এখনও সে ছোট তাই ছোট ছোট পা ফেলে মাথা নেড়ে যখন ছুটে আসে, লম্বা সাদা লোমগুলোর চোখ ঢেকে যায়—কী ভালো যে লাগে ওকে তা বলা যায় না।

ওর নাম পম্‌। মিষ্টুর পম্‌কে দেখলে আদর করতে ইচ্ছা হয় সত্যি, কিন্তু এমনও কতকগুলো ভীষণাকার কুকুর আছে যা দেখতে আদর করা বা কাছে যাওয়া দূরে থাকুক আতঙ্কে হাড় হিম হয়ে যায়।

কিন্তু এরা খুব প্রভুভক্ত হয়, সে কথা হয়তো ছোটবেলা থেকেই তোমার নীতিসুধা, শিক্ষা সোপান প্রভৃতি বইএ পড়ে থাকবে—তাই নয়?

সত্যিই ওরা প্রভুভক্ত! মনিবের এতটুকু অনিষ্ট হয় এ তারা চায় না, সে যে জাতের কুকুরই হোক না কেন। মিষ্টুর পমের মতই হোক, বা বিরাট লক্‌লকে জিব এ্যালসেসিয়ানই হোক! মনিবের জন্য এরা সবই করতে পারে। অচেনা বা নতুন লোক এলে

ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি শুরু তো করবেই যতক্ষণ কেউ না বেরোয় সেই নতুন অতিথিকে ভিতরে ঢুকতে পর্যন্ত দেবে না। আবার বাড়ীর ছেলেমেয়ে আগলে রাখবে। ছোটখাট বিপদ থেকে বাঁচাতে কুকুরের মত এমন উপকারী জীব আর নেই বললেই হয়। বেড়াল সেতো জমিদার গিন্নি। খাবেন দাবেন, চোখ বুজে খাটের তলায় কুশন চেয়ারে কিম্বা আরো কোনো ভাল জায়গায় বড়লোকী চালে লেজ গুটিয়ে আরামে শুয়ে থাকবেন। সুবিধা হলে বাড়া ভাতের মাছখানা, দুধের বাটিটার সদ্ব্যবহার করে নেবেন। তাই কিছু উপকার নেই, ভালোভাবে খেয়ে মোটা হওয়া ছাড়া এমনি তফাৎ কুকুর আর বেড়ালে।

তবুও শোনা যায়—বেড়াল নাকি ষষ্ঠী-ঠাকরুণের বাহন, তাঁর কাছেই ঘোরাফেরা করে, তাই ঠাকুমা দিদিমাদের কাছে তাদের অনেক আদর।

কুকুর বেড়ালের অনেক ঘটনার গল্পের কথা শোনা যায়—তার মধ্যের মজার ঘটনা না থাকে এমন নয় কিন্তু সাংঘাতিক ঘটনাও থাকে।

আজকাল বাড়ীতে কুকুর রাখার খুব চল—ঠিক চল না হলেও, চুরির ভয়ে প্রায় বাড়ীতেই কুকুর থাকে। কিন্তু বিদেশে বা ফাঁকা জায়গায় থাকতে গেলে একটি ভাল কুকুরের অবশ্যই দরকার। বিপদ থেকে তারা বাঁচাতে পারে। আর রাতে পাহারা দেবার জন্য কুকুরের মত এমন বিশ্বস্ত পাহারাদার খুব কম দেখা যায়।

বিহারের একটা জায়গায় মিঃ রায় নামে এক ভদ্রলোক বেশ ভালো কাজ করতেন কলিয়ারীতে। তার বাংলো ছিল দূরে—একেবারে জনশূন্য স্থানে। বাড়ীর লোকজন ছাড়া আর কোনো বাইরের সঙ্গী পেতেন না তারা, আর মিলবার মিশবার জন্য দেখা করতে হলে শহরে আসতে হতো। এই রকম নির্জন জায়গায় থাকতেন বলে মিঃ রায় তিন চারটে এ্যালসেসিয়ান কুকুর রেখে-ছিলেন—না রেখে উপায়ও ছিল না, কারণ ও-রকম জায়গায় থাকলে চোর ডাকাতে মেরে কেটে টুকরো করে রাখলেও কেউ জানতে

পারবে না। এই কুকুরগুলোই তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। আর বাড়ীর যে কটি লোক সকলেরই তো চেনা, কাছাকাছি কেউ নেই, অতিথি এলে এরা বুঝিয়ে দেন বা সামলে রাখেন। তারাও প্রভুর মঙ্গল খোঁজে বৈকি! কিন্তু ভীষণ চেহারার এ্যালসেসিয়ান—হাঁ করে এগিয়ে এলে ভয়ে প্রাণ চমকিয়ে ওঠে, আবার যদি একটার বেশি হয় তাহলে তাকে দেখেই ভয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়বার দেরী হয় না। কি ভীষণ তার মুখের চেহারা, আর তেড়ে এসে চীৎকার!

আজকাল চোরেরাও কিন্তু খুব সাবধান হয়েছে! চুরি ডাকাতি করতে এলে আগে থেকে প্ল্যান করে নেয় আর যে সময় বাড়ীর সকলে বিশ্রাম করে তখন মাংসের টুকরোর সঙ্গে ওষুধ মাখিয়ে কুকুররা দেখতে ও খেতে পায় এমন জায়গায় ফেলে রাখে। বাড়ীর বাইরে থেকে বেশ কয়েকদিন ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে, আর দুপুরে পুরুষরা বাইরে যান, মেয়েরা বিশ্রাম করেন, চাকর-বাকরও ঘুমোয়, তাই তারাও ঠিক সময়টা জেনে বুঝে ছুঁড়ে ফেলে। এই রকম কয়েকদিন করলে ওর মধ্যে যে ওষুধ দেওয়া আছে তার গুণে ওদের নেশা ধরে ঝিমিয়ে পড়ে—এইভাবে ওদের কায়দায় এনে তারপর তারা আক্রমণ করে। শুধু কি কুকুর, ঘরের ভিতর মানুষ অঘোরে ঘুমুচ্ছে, আর জানালা দিয়ে স্প্রে করলো ঘুমের ওষুধ—তারা ঘণ্টা দুই আড়াই বেশ ঘুমিয়ে রইল আর তারা বাড়ী ঢুকে যা নেবার নিয়ে চলে গেল।

চুরির বাহাদুরী।

তবে আজকের এই গল্প চোরদের নিয়ে নয়, কুকুরদের নিয়ে—তাই এখন সেই কথায় আসা যাক।

মিঃ রায়ের সেই জনশূন্য জায়গায় বাড়ীতে বাইরের লোক যখন আসতেন তাঁরা কুকুরদের বেশ সামলে রাখতেন।

সেবার পূজোয় তাঁর ছোট জামাই আসছে, বাড়ীতে খুব হৈ-চৈ আনন্দ—আর সেইজন্যই পূজোর ছুটিতে তাঁরা দেশে এলেন না, ওখানেই থাকলেন—সব ছেলেমেয়ে নিয়ে। ছোট মেয়েটির বিয়ে হয়েছে এইমাত্র কয়েকমাস আগে। মেয়ে এখানে আছে। আরো দু'চারজনের আসবার কথা আছে তবে তার এখনও দেরী আছে।

এই চারটি কুকুরের মধ্যে রেভার হলো সব চেয়ে বড় আর আগে এসেছে এ বাড়ীতে। দলের সর্দার আর কি! রেভার এ বাড়ীর সকলকে চেনে অন্যরাও চেনে কিন্তু ছোট জামাইকে তারা দেখেনি। তবে এলেই তো দেখবে। তাছাড়া রেভার একবার যাকে দেখে আর তাকে ভোলে না।

যেদিন জামাই আসবে সেদিন বাড়ীতেও সাড়া পড়েছে খাবার দাবার তৈরী হচ্ছে, ঘর দোর সাজানো গুছানো হচ্ছে, মিঃ রায়ও সন্ধ্যায় জামাই আনতে ষ্টেশনে গাড়ী পাঠালেন এই ট্রেনে তার আসবার কথা। কিন্তু গাড়ী ফিরে এলো জামাই আসেন নি। মিঃ রায় ভাবলেন তাহলে কোনো কারণে হয়তো এই ট্রেন ফেল হয়েছে রাত আটটার গাড়ীতে নিশ্চয় আসবে জামাই।

আবার রাত্ আটটায় লোকজন আলো গাড়ী সব ষ্টেশনে পাঠানো হলো। কলকাতার মত শহরের জায়গা আটটায় সন্ধ্যে রাত। কিন্তু এইসব স্থানে বিকেল হতে না হতেই নির্জন হয়ে যায়, আর সন্ধ্যা উত্তরে গেলেই মনে হয় গভীর রাত হয়ে গেল। কিন্তু আটটার গাড়ীও চলে গেল, লোকজন সব ফেরৎ এলো, জামাই এ গাড়ীতেও আসেননি।

কেন এলো না বলো তো? মিসেস রায় জিজ্ঞাসা করলেন। কপাল কুঁচকে মিঃ রায় বললেনঃ কি করে বলবো বল? হয়তো কোনোও কারণ ঘটেছে। এরপরের ট্রেন সেই রাত একটায় তখন নিশ্চয় আসবে না। কালই আসবে আর না আসে তখন খবর করবো।

কিছূটা চিন্তা নিয়েই সকলে সেই প্রচুর আয়োজনের খাওয়া দাওয়া সেরে শুতে গেলেন।

অনেক রাত পর্যন্ত মিঃ আর মিসেস রায়ের চোখে ঘুম এলো না। রাত একটু বেশি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ভেঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি নামলো। কী সাংঘাতিক বৃষ্টি মনে হচ্ছে, পৃথিবী ভেসে গেল যেন।

অনেক রাত যখন চোখে বেশ গভীর ঘুম নামছে রায়ের মনে

হলো। কুকুরগুলো যেন ভয়ঙ্করভাবে চীৎকার করছে, তবে বৃষ্টির অবিরাম শব্দে তা মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এত ঘুম নেমেছে চোখের পাতায় যে তিনি পাশ ফিরে শোবার সংঙ্গে সঙ্গে একেবারে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

সকালে উঠে যা খবর পাওয়া গেল তাতে মিঃ রায় সেইখানেই বসে পড়লেন আর বাড়ীতে কান্নার রোল উঠলো। মিঃ রায় নিজে গিয়ে দেখলেন মানুষের বড় বড় হাত পায়ের ক'খানা হাড়, নখ চুল ইত্যাদি চারিদিকে ছড়ানো আর চারটে এ্যালসেসিয়ান নির্বিকার-ভাবে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। বুঝতে বাকী রইল না ঘটনাটা কি ঘটেছে। জামাই রাত দু'টোর গাড়ীই ধরেছিল। মিসেস রায় ছুটে এলেন, ছেলেমেয়েরা সবাই এলো ঘটনাটা জলের মত স্বচ্ছ হয়ে গেল। মিসেস রায় আর ছোট মেয়ে দু'জনেই আছড়ে পড়লেন। সকালবেলাই এমন নিদারুণ বিপদের সামনে পড়ে মিঃ রায় কেমন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরে পুলিশে খবর পাঠালেন।

বাড়ীতে কান্নাকাটি থামছে না, মেয়ে সেই যে আছাড় খেয়ে পড়েছে আর উঠছে না। এই রকম অবস্থার মধ্যেই পুলিশ এসে গেল।

কিন্তু কি রিপোর্ট দেবেন মিঃ রায় কিছুই বলতে পারছেন না শুধু তাদের নিয়ে গিয়ে সব দেখালেন। তাঁরা বললেন আপনার পোষা এ্যালসেসিয়ান, তাছাড়া জামাইকে কি চিনতো না?

না, কারণ জামাই আর আসেননি, তাছাড়া মোটেই এই ক'মাস বিয়ে হয়েছে তাও বিয়ে দেওয়া হয়েছিল দেশের বাড়ীতে, আমার মা অসুস্থ, বৃদ্ধ হয়েছেন আসতে পারবেন না তাই! তাছাড়া কাল জামাই তো সোজা পথে আসতে পারেন নি, হয়তো ডাকাডাকি করেছেন কিন্তু বৃষ্টির দাপটে তখন কিছুই শোনা যায়নি। এই যে দেখুন, পাঁচিলের গায়ে মোটা দড়ি এইটে ধরেই হয়তো আসতে চেষ্টা করেছিলেন! অনেক রাতে আমি যেন এই কুকুরদের ডাক শুনেছিলাম মনে হচ্ছে কিন্তু তখন এত গভীরভাবে ঘুম এসেছে

যে বিশেষ কিছু মনে নেই। পুলিশের লোকেরা খুব দুঃখিত হয়ে সব রিপোর্ট নিয়ে বললেন, সত্যি খুব দুঃখের ব্যাপার মিঃ রায়। পাঁচিল টপকে না আসবার চেষ্টা করে যদি ষ্টেশনে ওয়েটিং রুমেও রাতটা কাটিয়ে আসতেন আপনার জামাই, তাহলে এই দুঃখের কারণটা ঘটতো না।

মিঃ রায় বললেন, এরকম দুর্ঘটনার কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি।

পুলিশের লোকেরা বিদায় নিয়ে, তদন্তের আশ্বাস দিয়ে গাড়ীতে উঠছেন। এই সময় আর একটি গাড়ী এসে থামলো। সকলে সেদিকে তাকিয়ে দেখে চমকে উঠলেন সুটকেশ ও হোল্ডঅল নিয়ে হাসিমুখে জামাই গাড়ী থেকে নামছেন।

সবাই হঠাৎ আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। আঁচল লুটোতে লুটোতে মিসেস রায় এসে চোখ মুছে দু' হাতে জামাইকে জড়িয়ে ধরলেন।

বিষাদের কালিমা মুছে গেল। জামাই জানালেন ট্রেন ফেল হওয়ার জন্যই এই ট্রেন ধরেছেন। সমস্ত ঘটনাটি শুনে জামাই বললেন, আমার পরমায়ু বেড়ে গেল তাহলে !

পরে পুলিশ তদন্তে জানা গেল যে একটা দাগী চোর ঐ ঝড় জলের রাত্রে চুরি করতে এসেছিল দড়ি ধরে নামতেই চারটি এ্যালসেসিয়ান তাকে ঘেরাও করে যথেচ্ছাচার করেছে। বৃষ্টির দাপটে তার সব চীৎকার ব্যর্থ হয়েছে।

চারটে এ্যালসেসিয়ান নির্বিকারভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এত বড়র ঘটনার কোন রেখাপাত হয়েছে তাদের মনে তা বোধ হয় না ! চোর না এসে জামাই এলে কি দশা হতো তা বুঝতেই পারছো।



স্বর্গের গান

আগমনীর আবাহনে
কি সুর উঠিছে বেজে,
দোয়েল শ্যামা ডাক দিল ঐ
বরণের এয়ো সেজে।

কবিতাটি তোমরা পড়েছ আর—

দোয়েল, শ্যামার মিষ্টি গানও হয়তো তোমরা শুনেছ। কত পাখী কত চমৎকার দেখতে আর তাদের কণ্ঠস্বরের মিষ্টি গানও কত চমৎকার। সব পাখীই যে মিষ্টি ডাক দেয় বা গান করে তা নয় —তবে অনেক পাখীর ডাকই মিষ্টি লাগে। তোমরা যারা শহরে থাক তারা হয়তো পাখীর গান শুনতেই পাওনা—কদাচিৎ বসন্ত-কালে ইঁট কাঠ ঘেরা পাঁচিলের আড়ালে কোনো ঝাঁকড়া মাথা গাছের ভিতর থেকে 'কুহু' করে ডেকে ওঠা কোকিলের একটু

আওয়াজ পাও। কিন্তু যারা শহরের বাইরে আছ তাদের নানা ধরণের গাছপালা বা নানা জাতীয় পাখী দেখবার সুযোগ হয়। কিন্তু শহরে থাকলেও অনেক পাখীর নাম চেনো বা কাউকে কাউকে দেখবার সুযোগও হয়ে যায়। চিড়িয়াখানা ছাড়াই বলছি। দেশী বিদেশী কত রকম পাখীই তো দেখা যায়। আবার যাদের দেখিনি তাদের গল্পও শোনা যায়—ছবিও দেখা যায়—আচ্ছা বিদেশী পাখী পেলিকানের কথা ভাবো, মনে হয় না কি কেমন আঁট সাঁট জামা পরে ফিটফাট বাবুসাহেব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে? এমনি দেশী পাখীও কত রকম আছে, কাকাতুয়ার হলদে ঝুঁটি থেকে, রাঙা ঠোঁট টিয়ার কথা ছেড়ে দিয়ে বহু চমৎকার পাখী আছে, যার কথা শুনে কান জুড়োয় —তাই নয় দেখলে নয়নও জুড়োয়।

কি বলছিলাম বলোতো? হ্যাঁ গল্প, এবার গল্পই বলবো তোমাদের। সুকণ্ঠ দোয়েল পাখীর কথাই বলি—কি বল?

একটা বিরাট ঝাঁকড়া মাথা গাছ অসংখ্য তার শাখা প্রশাখা। পাতায় পাতায় ভর্তি এত ডালপালা আর এত পাতা যার ভিতরটা খুব ভালো করে দেখা যায় না। এই গাছটায় সব পাখীদের সভা হয়। প্রতিদিনই একটা নির্দিষ্ট সময়ে সব পাখীরা এসে জড় হয়। আর সভাপতি ঈগল পাখী এই সভায় সভাপতিত্ব করে। শুধু তাই নয় সকলের অভিযোগ শোনা, তার ব্যবস্থা—সুখ দুঃখ, সব বিবাদের মীমাংসা করা কিছুই বাদ যায় না।

এইরকম একদিনের সভায় সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। উপস্থিত পাখীদের মধ্যে অথবা যারা অনুপস্থিত ছিল—তাদের মধ্যে কার কণ্ঠস্বর ও সঙ্গীত সবচেয়ে ভালো এই হলো আলোচনার বিষয়-বস্তু।

অনেকে অনেক রকম মত প্রকাশ করলে। একদল আর এক-দলের রূপের প্রশংসাই করলে আসলে সঙ্গীতের কিছু জানে না। অপরদলের মতে কেউ কেউ সঙ্গীতের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছে এ রকম কথাও শোনা গেল।

শালিখ বলে: বলোনা ভাই তোমাদের সঙ্গীতের কথা, পৃথিবীর

মানুষগুলো কোকিলের কুহু রব শুনেই মুগ্ধ হয়ে যায়, বউ কথা কও, পাপিয়া এরা কিই বা কথা বলে ঐ শুনে তারা 'আহা কী সুন্দর', বলে অস্থির হয়।

—মানুষদের কথা ছেড়ে দাও, ওরা বাড়ীতে খাঁচায় পাখী পোষে, আর নিজেদের বলা ভাষা তাদের শেখাতে চায়। বেশি দিন শুনে শুনে আমরা সেই কথাগুলোই বলতে অভ্যস্ত হয়ে যাই—আর ওরা বলে ঃ পাখীটা কি সুন্দর কথা বলছে। আসল কষ্টটাই ওরা বোঝে না আমাদের। খাচায় বন্দী করে কথা শুনতে চায়—লাল ঠোঁট ঘুরিয়ে টিয়া বলে উঠলো।

—মানুষেরা যা ভালোবাসে বাসুক—কিন্তু যাকে বলে আসল সঙ্গীত তা শিখতে হলে পৃথিবীর মানুষ কেন—পাখী জাতও পারবে না—বুলবুলি বলে উঠলো।

—তুমি কি বলছো ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না যে—কাকাতুয়া কর্কশ কণ্ঠে বল্লে।

—আজ যা বিষয়-বস্তু নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তাতে তোমার কণ্ঠস্বর নিতান্তই বেমানান লাগছে—ময়না বল্লে।

—কিন্তু ময়নামাসী, কাকাতুয়া দাদার কণ্ঠস্বর একটু তীক্ষ্ণ হতে পারে কিন্তু মানুষদের মত সব কথাও বলতে পারে জানো?

—তুমি থামো তো চন্দনা, কথা বলা আর সঙ্গীত দুটো এক জিনিস নয়—একথা ভুলে যেও না।

এবার সভাপতি ঈগল পাখা দুটো একটু ফুলিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলো ঃ আজকের আলোচনার বিষয়-বস্তু কিন্তু বদলে যাচ্ছে। আমাদের পাখী সমাজে যারা কিছু গান জানে তা মোটামুটি শ্রুতি-মধুর হলেও, আসল সঙ্গীতের জন্য সাধনা দরকার, শিক্ষা দরকার।

কাঠঠোকরা বলে উঠলো ঃ ঠিক, ঠিক, ঠিক—সব কিছুরই সাধনা চাই, ফাঁকি দিয়ে কোন মহৎ কাজ হয় না। তাছাড়া তোমরা তো সব আধুনিক গান করো—ফুল, চাঁদের আলো, আকাশ, বাতাস হলো তোমাদের গানের কথা—কিন্তু সত্যিকারের যে সঙ্গীত সে ক'টা পাখী গাইতে পারে?

—সেইজন্য বলছি শিক্ষা দরকার, সাধনা দরকার।

ঈগলের গম্ভীর কণ্ঠ শুনে আলোচনা কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেল। এবার ময়নামাসী বলে উঠলো : আপনি ঠিকই বলেছেন—কিন্তু যে সঙ্গীতের কথা আপনি বলছেন—তা শিক্ষা করতে গেলে কি করতে হবে?

—করতে অনেক কিছুই হবে—এখানে বসে কিছুই হবে না—শালিখ বল্লে।

—ছোট্ট ফিঙে বলে উঠলো : এখানে যদি না হয়—কোথায় যেতে হবে?

—স্বর্গে!

—হ্যাঁ স্বর্গে, আমি যে সঙ্গীতের কথা বলছি তা মর্তে কেউ শোনাতে পারবে না, জানেও না তাই যদি সেই সঙ্গীত আয়ত্ব করতে হয় তা হলে কাউকে পাঠাতে হবে।

ঈগলের মুখ থেকে একথা বার হওয়ামাত্র পাখীর দলের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন উঠলো—সকলেই সকলের দিকে তাকিয়ে দেখলো, সকলের চোখে মুখে একই প্রশ্ন—কে যাবে, কে যাবে।

সত্যিই তো কে যাবে?

ভরসা করে এগিয়ে এলো ছোট্ট টুনটুনি—মাথা নত করে ঈগলকে বল্লে, আমাদের এই পাখীরাজ্যের আপনিই প্রধান, আপনি যদি স্বর্গে গিয়ে সেই অপূর্ব সঙ্গীত শিক্ষা করে আসেন—তবেই সব দিক থেকে শোভন হয়।

এতক্ষণ যারা সেই কথাই বলবে ভাবছিল—তারাও সমবেতভাবে বলে উঠলো ! টুনটুনির কথায় আমরাও একমত হচ্ছি। আপনারই যাওয়া উচিত।

—আচ্ছা ভেবে দেখি, কালকের সভায় এই প্রস্তাবের উত্তর দেবো।

সেদিনের মত সভা শেষ হলো। ঝাঁকড়া মাথা গাছটা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বিভিন্ন রকমের পাখী উড়ে উড়ে নীল আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেল।

ঈগলের আজ যাত্রার দিন।

দলে দলে পাখীরা এসে জড় হয়েছে সেই ঝাঁকড়া মাথা গাছটার কাছে। আজ কেউ আর গাছের ডালে বসে সভা জমাচ্ছে না, সভাপতির স্থানটাও খালি। আজ তারা সকলেই দল বেঁধে বিদায় অভিনন্দন জানাতে এসেছে ঈগলপাখীকে—তার 'যাত্রা শুভ হোক' এইধ্বনির সংগে। যথাসময়ে সকলের শুভেচ্ছা নিয়ে ঈগল আকাশে উড়লো—প্রথমে মন্দগতি, তারপর দ্রুতগতি হতে লাগলো—সব পাখীরা আকাশের দিকে চোখ তুলে—যতক্ষণ দেখা গেল দেখতে লাগলো—তারপর ক্রমশঃ বিন্দুর মত হতে হতে ঈগল মিলিয়ে গেল।

এবার বাসায় ফেরার পালা। টুনটুনি বল্লেঃ আচ্ছা সকলকেই দেখলাম, দোয়েল কোথায় গেল—সভাপতির বিদায় সম্বর্দ্ধনায় কিম্বা যাত্রাকালে তাকে তো দেখতে পেলাম না।

সত্যি দোয়েলকে কেউ দেখেনি। তার সম্পর্কে অস্ফুট গুঞ্জন হতে লাগলো, কে জানে, গেল কোথায়, আজ তো তার উপস্থিত থাকা উচিত ছিল।

কিন্তু তাকে দেখতে পাওয়া গেল না—কথা বলতে বলতে সকলেই ফিরে এসে ঝাঁকড়া মাথা গাছটার নীচে অপেক্ষা করতে লাগলো—ঈগলের ফিরে আসা পর্যন্ত। ঈগল উড়ছে তো উড়ছেই!

ধীরে ধীরে উড়তে আরম্ভ করে গতি দ্রুত হয়ে এলো। মনের মধ্যে কত-আশা-আকাঙ্খা নিয়ে সে উড়ছে, মাঝে মাঝে পৃথিবীর কথাও মনে পড়ছে। উড়তে উড়তে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে—এতক্ষণ ভালই লাগছিল—কিন্তু এবার যেন গরম লাগছে, বেশ গরম—সূর্যের তেজই এই তাপমাত্রা বাড়িয়ে তুলছে। আরো কিছুক্ষণ এই তাপের মধ্যে দিয়েই ঈগল উঠতে লাগলো, কিন্তু আর পারা যাচ্ছে না, পাখাগুলো জ্বালা করছে কণ্ঠতালু শুকনো হয়ে এসেছে—মনে হচ্ছে একটু পরেই তার ঝলসে যাওয়া দেহ স্থির হয়ে যাবে। এতদূর এসেও তাহলে তার সব নষ্ট হয়ে যাবে। অনেক অনেক দূর সে এসেছে আর একটুখানি মাত্র কিন্তু একেবারে সূর্যের কাছাকাছি এসে পড়েছে যে, আর একটুখানির কথা সে ভাবতে পারছে না, উঃ আর পারা গেল না।

সত্যিই আর পারলো না ঈগল- নীচের দিকে নামতে সুরু করলো, পুরোপুরি নীচে নেমে সেই গাছের নীচে আসতে পারবে এ আশা তার হচ্ছে না—কিন্তু যদি সে আসতেই পারে তবে যারা তার জন্য অপেক্ষা করে আছে সেই পাখী গোষ্ঠীকে কি বলবে সে? পাখী গোষ্ঠীর রাজার শেষে এই পরিণাম হলো? মনে মনে লজ্জা বোধ করলেও ঈগলের মনে হচ্ছিল মাটিতে নামবার আগেই সে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়বে—তার গতি মন্দ হয়ে এসেছে, ঝল্‌সে যাওয়া পাখা আর ভর সইছে না।

ঠিক সেই সময় তার কাঁধের কাছে ভারী মোটা পালকের ভিতর থেকে ছোট্ট একটা কি যেন ফুরুৎ করে উড়ে গেল। ঈগলের তখন কিছুই বোধগম্য হচ্ছিল না। আপনা আপনি তার দেহ নীচের দিকে নেমে আসছিল।

ঈগলের কাঁধের কাছ থেকে বেরিয়ে গেল দোয়েল। সে উড়তে উড়তে একেবারে শূন্যে মিলিয়ে গেল। তার মনে হলো ঈগলের যাত্রা যখন ব্যর্থ হলো তখন এবার তার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ রইল না, স্বর্গের অপূর্ব সঙ্গীত শিখে সে সমস্তপৃথিবীকে সেই গান শোনাতে পারবে। পরম আশ্চর্যে সারা পৃথিবী সেই গান শুনবে আর তার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠবে। আর কোনও পাখীর এই গান শোনাবার দক্ষতা থাকবেও না—আমিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবো।... ভাবতে ভাবতে দোয়েল স্বর্গের সেই স্থানে উপস্থিত হলো।

ঈগল এসে পৌঁছুলো। দেহে তার আর কোনো শক্তি সামর্থ নেই, মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরুচ্ছে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে বড় গাছের নীচে যে সব পাখীরা অপেক্ষা করছিল তারা চারিদিক ঘিরে এল। তারা খুশী মনে প্রস্তুত হচ্ছিল রাজা এসে তাদের গান শোনাবে—সেই গান তারা শিখে সারা জগৎকে শোনাবে —কিন্তু একি হলো? ঈগলের অবস্থা যা তাতে সে বেঁচে উঠবে বলে ভরসা নেই। কিন্তু কোনো খবরই তো সংগ্রহ করা সম্ভব হলো না। সকলে মিলে যথারীতি সেবা আরম্ভ করে দিলে—পাখীদের কবিরাজ এসে পরীক্ষা করলো। সকলেই উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা

করতে লাগলো ঈগলের কি হয়। কেন এরকম হলো—অনেক দূর অগ্রসর হতে দেখেছে তারা ঈগলকে। পাখীরাজ্যে এমন শক্তিধরকে পাঠানো হলো আর সে অকৃতকার্য হয়ে ফিরে এলো—এ কি রকম কথা? ঈগল সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কিছুই জানা যাচ্ছে না।

স্বর্গের অপূর্ব সঙ্গীত আয়ত্ব করে দোয়েল ফিরে এসেছে। পৃথিবীতে নামবার পথে দোয়েল কত কথাই ভাবছিল। কোনো পাখী এ পর্যন্ত এমন মধুর সঙ্গীত শোনাতে পারেনি সেই সঙ্গীতের অধিকারী হয়ে সে ফিরেছে। শুধু পাখী সমাজেই নয়—মানুষেরাও তার গান শুনে বিস্মিত হয়ে বলবে এমন গান আর কোনো পাখীর কণ্ঠে শোনা যায়নি—সে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে...ভাবতে ভাবতে দোয়েলের মন আনন্দে আর অহঙ্কারে ভরে উঠেছিল। ঈগল ব্যর্থতা লাভ করলেও সে সার্থক হয়েছে—জয়ী হয়েছে। দোয়েল এসে ঈগলের অবস্থা দেখলো, একমাত্র সেই জানে, ঈগল কত কষ্টে, কতদূর উড়ে গিয়েছিল, কত চেষ্টা করেছিল সে আর কিছুটা অগ্রসর হবার—সূর্যের কাছাকাছি এসেও তার চেষ্টা চলেছিল, ভেবেছিল আর একটু যদি এগিয়ে যেতে পারি—কি অসহ্য তাপ সে তাপে তার সর্বাঙ্গ পুড়ে যাবার মত হলেও চেষ্টা করেছে, তারপর যখন সত্যি ঝল্‌সে গেল পাখা, আর যখন কোনো ক্ষমতা রইল না তখন কি অবস্থায় তাকে নামতে হয়েছে তা একমাত্র দোয়েলই জানে। যাবার পথে তাকে কোনো কষ্ট করতে হয়নি, খুব আরামে, অনেক স্বচ্ছন্দে চলে গেছে—কিন্তু যে কষ্ট করে মৃতপ্রায় হয়ে আছে, বেঁচে ওঠার ভরসা যার নেই সে বিফল হয়েছে। দোয়েল অনেকক্ষণ ধরে সব দেখলো—অনেকক্ষণ চিন্তা করলো, সে যা পেয়েছে তা অনায়াসলব্ধ, এর জন্য তাকে কোনো ক্ষতি স্বীকার করতে হয়নি, কোনো পরিশ্রম করতে হয়নি অথচ সে পেয়েছে।

ভাবতে ভাবতে তার নিজের মনে ধিক্কার এলো। এতক্ষণ সে মনে করেছিল গান শুনিয়ে সে বাহবা নেবে। পাখী আর মানুষ ধন্য ধন্য করবে আর সে গর্ব অনুভব করবে—কিন্তু কি করেছে সে—এর জন্য যদি কিছু প্রাপ্য থাকে তা হলো ঈগলের। নিজের প্রতি

ঘৃণা হলো তার। অনেকক্ষণ ঈগলের অশক্ত দেহের কাছে বসে বসে ভাবলো, দু'চার ফোঁটা চোখের জল ফেললো। তারপর মনে হলো, না সে আর থাকবে না, মানুষ বা পাখী তাকে দেখতে পায় এমন স্থানেই সে আর থাকবে না। যে সঙ্গীতের অধিকারী সে হয়েছে তা সকলকে শুনিয়ে আর বাহাদুরী নেওয়া হলো না, মনের গতি বদলে গেছে। তাই কয়েকদিন পরে যখন ঈগল সুস্থ হয়ে উঠবে এমন আশা দেখা গেল—দোয়েল তখন মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেখান থেকে নিঃশব্দে চলে গেল। নীল আকাশের মাঝে পাখা দু'খানা ছড়িয়ে দিয়ে উড়তে উড়তে কখন কোথায় মিলিয়ে গেল। দোয়েলকে আর কেউ দেখতে পেলো না।

মানুষের কাছ থেকে পাখীদের কাছ থেকে দোয়েল অনেক দূরেই থাকতে চাইলো তাই উড়তে উড়তে সে মিলিয়ে গেল।

দোয়েলের এই আত্মগ্লানিই তার মনের সব অহঙ্কার নষ্ট করে দিলো, ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করলো—এতবড় সুকণ্ঠের অধিকারী খুব কম পাখীই দেখা যায়। কিন্তু তোমরা সচরাচর দোয়েলকে দেখতে পাবে না, সঙ্গী সাথী ছেড়ে একলাই ঘুরে বেড়ায় আর ভগবানের দানে যে সুকণ্ঠ পেয়েছে—সেই কণ্ঠে অপূর্ব সঙ্গীত গায়। মনে হয় কোনো সাধু সন্ত ভজন করছেন। আসল প্রাণীটিকে সচরাচর দেখা যায় না, তবে তার গান শোনা যায়। আমরা তার গান শুনে খুসী হ'য়ে দেখবারও চেষ্টা করি—কিন্তু ওরা যেই সে কথা বুঝতে পারে উড়ে চলে যায়, একা একা থাকতে ভালবাসে। বিদেশীদের চোখে ওরা সত্যিই সাধু-সন্ন্যাসী।



মার কথা না শুনলে

য়্যাক্সিডেণ্ট। এ কথাটা বা শব্দটির সঙ্গে তোমাদের পরিচয় আছে। যারা শহরে থাকো তাদের তো চাক্ষুষ পরিচয়ই আছে। আর প্রতিদিন সংবাদপত্র খুলে দেখবেই কোনো না কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছেই আর ছবিসহ তার আনুপূর্বক বিবরণ বেরিয়েছে। জরুরী কাজে, অকাজে আনন্দে কিম্বা বেড়াতে, পিকনিক করতে আত্মীয়-স্বজনের কাছে যেতে গিয়ে হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই, আগামী নোটিশ নেই—একেবারে হুড়মুড় করে এসে পড়া—ফল ছত্রভঙ্গ, জীবনটি খোয়ানো। এই সমাচার শুনতে, পড়তে পড়তে প্রায় অভ্যাসই হয়ে এলো। কিন্তু 'কি' হয়েছিল তার বিবরণটি শুনে মনে হয় ক'দিন আগে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে এই তারই সমগোত্র কিম্বা কিঞ্চিৎ বেশি! ট্রেনের সময় ফিসপ্লেট সরিয়ে নিয়েছে—তাতে ভীষণ ট্রেন দুর্ঘটনা—মানুষরা সব দলা পাকিয়ে গেছে, লাইনের ধারে শাঁখা-চুড়ি পরা ছিন্ন হাত পড়ে আছে। বসবার বেঞ্চিতে

যারা ঘুমিয়েছিল—উপরের বাঙ্ক ভেঙ্গে তার উপর পড়ে গিয়ে মানুষটি চেপ্টে কাগজের মত পাতলা হয়ে গেছে। এরকম ভয়াবহ দুর্ঘটনা রোজ না ঘটলেও মাঝে মাঝে ঘটে। আর পথে প্রান্তরে যদি দুর্ঘটনা হয় তখন চোর ডাকাতের দলও তৎপর হয়ে ওঠে। আধমরা মানুষগুলোকে সেবা যত্ন করে সুস্থ না করে—মেরে ফেলে, তাদের যা-কিছু আছে সব নিয়ে চম্পট দেয়। য়্যাক্‌সিডেণ্ট যেখানে ঘটে—তারপর মৃতদেহগুলি সনাক্ত করবার জন্য তাদের সারি সারি শুইয়ে রাখা হয়। যাদের মুখের অবস্থা ভালো আছে—চেনা যায়, তাদের আত্মীয়স্বজন সনাক্ত করতে পারেন, যাদের মুখের অবস্থা ভয়াবহ হয় তাঁদের চেনা সম্ভব হয় না। তবুও চেষ্টা করা হয়। অবশ্য সাংঘাতিক ট্রেন বা অন্য দুর্ঘটনা সব সময় ঘটে তা নয়। তবে দুর্ঘটনা ঘটেই আছে—জলে, স্থলে অন্তরীক্ষে সর্বত্র আর সব সময়েই। এ ছাড়া বাড়ীতে, খেলবার মাঠে—সিনেমা দেখতে গিয়ে, রাস্তা পার হতে গিয়ে যদি পথের আলোর নির্দেশ না মানো, গঙ্গা বা পুকুরে মাছ ধরতে বা স্নান করতে, হঠাৎ পুড়ে যাওয়া, হঠাৎ নিদারুণ কেটে যাওয়া, ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়া, বৈদ্যুতিক শক্ লাগা এসব ছোটখাট ঘটনা তো আছেই।

আজ দেখলে সংবাদপত্রে বড় বড় হেড লাইনে বেরিয়েছে ভয়াবহ ট্রেন কিম্বা প্লেন দুর্ঘটনা—ট্রেন দুর্ঘটনায় তবু ছিন্নভিন্ন দেহ, বা মৃত, অর্ধমৃতের দেহ পাওয়া যায়, যদি প্লেন হয় তাহলে যাত্রী এমন কি পাইলট পর্যন্ত নিখোঁজ, কোনও চিহ্নই অনেক সময় পাওয়া যায় না। তবে এগুলো মাঝে মাঝে ঘটে থাকে। মোটর, লরী, ট্রাম বাস এসবের দুর্ঘটনা এ তো নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রমশঃ যেন এসবে একটা ভয় বা আতঙ্ক চলে যাচ্ছে, এ তো হচ্ছেই, এ তো হবেই এমন ভাব মনের মধ্যে হচ্ছে। সকলেরই তো কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা আছে।

এই তো সেদিন তপেনের দিদি রীনারা যাচ্ছিল প্লেনে। তপেনের মা বাবা সকলেই উঠিয়ে দিয়ে এলেন—মাত্র বোম্বাই কতক্ষণেরই বা পথ। কিন্তু পরের দিন খবরের কাগজ খুলেই সব চক্ষু স্থির—

বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে গেল—ঐ প্লেনটাই আগুন লেগে পুড়ে গেছে। মিণ্টুর বাবা পাইলট ছিলেন কি সুন্দর চেহারা তাঁর—কত জায়গায় গেছেন কত ঘুরেছেন, কত রকম বিপদাপদ তুচ্ছ করে প্লেনকে নির্বিঘ্নে নিয়ে ফিরে এসেছেন—কিছুই হয়নি। সরকারী কাজে কত পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু তিনিও একদিন নিদারুণ শীতের দিনে শীতের দেশ থেকে বেরোলেন—কিন্তু সে প্লেন আর ফিরলো না। মানুষটির কোন চিহ্নও পাওয়া গেল না। সরকারীভাবে কত খোঁজ খবর হলো, কত তল্লাস করা হলো পাহাড়ের দেশে—অন্য প্লেন নামিয়ে খোঁজ হলো—বরফের চাপ সরিয়ে অনুসন্ধান করা হলো কিন্তু সব ব্যর্থ হলো। মিণ্টুর বাবার সেই দীর্ঘ লম্বা ও চওড়া চেহারার কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না, প্লেনের দু'-একটা টুকরো ছাড়া আর যে দু'টি মানুষ ছিল তাদেরও না!

এইসব য়্যাক্সিডেণ্ট তো প্রত্যক্ষ দেখা মায়ের। মা তো সেদিন তাই অনুপমকে বললেন-মার কথা না শুনলে কত বিপদে পড়তে হয়। কিন্তু এই যে এতসব দুর্ঘটনা ঘটে তাদের সবাই কি মার কথা শোনেনি? তাতো হয় না। কিন্তু অনুপম যত ভাবে ততই ভাবনাগুলো জট পাকিয়ে ওঠে। সেদিন স্কুল থেকে ফিরবার পথে যা দেখেছিল এখন মনে হলে গা শিরশির করে ওঠে। লোহার রেলিং-এর মত লম্বা ছড়ি তবে অত মোটা নয়—ঠেলাগাড়ী বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছিল সামনে পিছনে বাস—রাস্তা পার হতে গিয়ে ভদ্রলোকের কি হলো যে কানের ভিতর এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল সেই লোহার লম্বা ছড়ি—যা গাড়ী থেকে অনেকখানি বেরিয়েছিল। লোকের চীৎকার, ভিড় আর বাস ট্রাম বন্ধ হয়ে গেল। লোকটি যে বেঁচে নেই সে খবর খানিকটা পরেই পাওয়া গেল আর পরের দিন খবরের কাগজে ছবিসহ দেখা গেল খবরটি। কতদিন অনুপম ভাল করে খেতে পারেনি, রাতে ঘুমতে পারেনি। স্কুলে যাবার সময় ঐ জায়গাটিতে দেখে কি রকম হতো যে তার মনে, কেমন ভয় ভয় করে উঠতো। কিন্তু তাহলে কি হয়?

অনুপম ভাবে ও লোকটিও কি তার মার কথা শোনেনি? মা যে বলেন—তাহলে একদিন পরীক্ষা করবে নাকি সে?

ভাবতে ভাবতে এই চিন্তাটা প্রায় ভুলেই এসেছে—এমন সময় একদিন হলো কি তখন কোলকাতা শহরে নিষ্প্রদীপ চলছে। চীনের হামলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা সবাই মেনে নিয়েছে—তাই সন্ধ্যা হলেই ছোটদের ঘরমুখো হয়ে চুপচাপ থাকতে হচ্ছে। ঘরের আলো যাতে বাইরে বেশি না যায় তার জন্যও ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

অনুপমের মত ছেলেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, খেলা শেষ হয় না ঘরে এসে ঢুকতে হয়। একদম ভালো লাগে না। কিন্তু উপায় কি বলো, এ তো করতে হবেই। মন মেজাজ খারাপ হোক আর যাই হোক অনুপমকেও সবাই-এর কথা মানতে হলো।

খেলার মাঠ থেকে এসে সেদিন অনুপম বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়েছিল। বাড়ী ঢুকতে ইচ্ছা হয় না, যদিও ওদের বাড়ীটা প্রশস্ত রাজপথের উপর। লেন নয় ষ্ট্রীট বা রোডও নয়—একেবারে এভেনিউ। বাড়ীর সামনে ঝুলোনো বারান্দা আর সেখানে দাঁড়িয়ে অনুপম সব দেখে—এপার ওপার এমন কি একটু দূরে ট্রাম লাইনের ঐ চৌমাথাটা, লাল সবুজ হলদে আলোগুলো পর্যন্ত। বড় বড় বাড়ীর নীচের দোকানঘর—সে সব বড় দোকান সেগুলো কখন খোলে কখন বন্ধ হয়, কোন্ লোকটি কি করে এসব তার মুখস্থ। বড় রাস্তার গা ঘেঁষে ছোট যে লেনটা বেরিয়ে গেছে, সেইটার কোণের দিকের ছোট্ট ঘরখানায় যে চানাওয়ালা থাকে—গরম মুড়ি, ছোলা চিঁড়ে ভাজে—আর তার পাশে বেগুনী ফুলুরিওয়ালা—এরা কি রকম তার পরিচিত সে শুধু সেই জানে। খেলার মাঠ থেকে ফিরবার সময় গরম বেগুনী ও পেঁয়াজীতে তার অনেক পয়সা খরচ হয়ে যায়। তাই অনুপমের খাতিরও খুব সেখানে।

ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে অনুপম চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। এমন সময় একটা মোটর এসে হর্ণ দিলো। অনুপম সেদিকে তাকিয়ে দেখলো—কিছুদিন তাদের বাড়ীতে কাজ করেছিল তারই বয়সী

নেপালী ছোকরাটা গাড়ীতে বসে বলছে ছোড়দা এসো তোমায় একটু ঘুরিয়ে আনি—এইটা আমার দাদার ট্যাক্সি এসো, এখনি ফিরে আসবো। অনুপম খুসী হয়ে উঠলো—চল চল যাচ্ছি কিন্তু মাকে বলা হলো না যে।

—এখনি দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে ঘুরে আসবে, তারপর মাকে বলো! আমিও মার সঙ্গে দেখা করবো, চট করে এসো।

অনুপম উঠে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে গাড়ী চালাচ্ছিল সে বললে কোথায় যাবো বল খোকাবাবু? তুমি তো আমার এই জাতভাই-এর বন্ধু, আর এও আমার বন্ধু, আমরা এক দেশের লোক।

অনুপম একটু না ভেবে উত্তর দিল ঃ শ্যামবাজার চলো, ওখানে আমার মাসীমার বাড়ী।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ ভাইয়া চলো, মাসীমার বাড়ী আমি আগে এসেছি, যখন আমি ছোটদার বাড়ী ছিলাম! মাসীমা খুব ভালো।

অনুপমের মন খুসীতে ভরে উঠেছে। একলা গাড়ী করে এসেছে মাসতুত ভাই-বোনদের কাছে; একি কম ডাঁট নাকি?

কত বড় হয়ে গেছে, একলাই চলে আসছে, মা বাবা বারণও করছেন না। বাড়ীতে ঢুকেই আগে রতনকে তারপর অনিতাকে মালা আর ববি, বনি, মিষ্টুদের ডাকবে, ওর গলার আওয়াজ পেলে বাবু রাধু রীতুরাও পাশের বাড়ী থেকে ছুটে আসবে এ কী কম কথা নাকি, তারা জানবে গাড়ী চালিয়ে আমি একাই চলে এসেছি—ইস্ খুব এক চোট আশ্চর্য করিয়ে দেওয়া যাবে।

—ছোটদা বেশি কিন্তু দেরী করো না মাসীমার বাড়ী। তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আমরা চলে যাবো, দাদার গাড়ী তো ভাড়া খাটবে।

—না, না, একটুও দেরী করবো না। কেবল ভাই-বোনদের সঙ্গে দেখা করেই চলে আসবো দেখ না।

অনুপমের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীটা একটা ঝাকুনী দিল। অনুপম বললে, এমন ভালো রাস্তা গাড়ী এমন করছে কেন ভাইয়া? কিছু খারাপ আছে কলকব্জা? সাবধানে চলো।

—না, না কিছু খারাপ নেই—স্টিয়ারিংএ হাত দিয়ে ভাইয়া বললে।

তার কথা শেষ হওয়ামাত্র আবার ভীষণ জোরে একটা ঝাকুনী এবং কিছু বলবার আগেই গাড়ীটা কাৎ হয়ে পড়লো—তার পরেই সঙ্গে সঙ্গে তার নীচের দিকটা বেঁকে একেবারে উপরে উঠে গেল নিদারুণ শব্দ করে।

বসবার কোচগুলো হুড়মুড় করে অনুপমের ঘাড়ে পড়লো, রাস্তা অন্ধকার, তারপর আরো ভীষণ অন্ধকার, কাঁচের জানলাগুলো ভেঙ্গে কাঁচের টুকরো ও গুঁড়ো গায়ে পড়ছে—। একটু পরেই অনুপম তার সাংঘাতিক অবস্থাটা বুঝলো। মনে হলো ক্ষীণকণ্ঠে কে যেন ছোটদা বলে ডাকছে। নিজের সমস্ত শক্তি একত্র করে অনুপম চীৎকার করলো ভাইয়া, এই যে আমি।

কিন্তু কে শুনবে কার কথা। চীৎকার করছে অনুপম, নড়বার মত স্থান নেই, সব অন্ধকার।

সেই অন্ধকারে অসহায় হয়ে অনুপমের মনে হচ্ছিল আর কারুর সঙ্গেই তার দেখা হবে না, এইখানে মরে পড়ে থাকবে। মা বাবা কেউ জানবেন না সে কোথায় গেল, তার কি হলো। সে যে বেরোচ্ছে এ কথাটাও যদি একবার চেঁচিয়ে বলে আসতো হরিকে। তাহলে মা জানতে পারতেন। দেরী হলে খোঁজ করতে পারতেন—কিন্তু একি অবস্থা। এখনি তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, কণ্ঠতালু শুকনো হয়ে গেছে, একটি শব্দও বার করতে পারছে না—এখনি মরে যাবে সে। হায়, হায়, কেন যে সে বেরিয়েছিল কিছু না ভেবে, এখন কোনো উপায় নেই।

কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ছে অনুপম—এমন সময় মনে হলো কে যেন বলছে, ওরে এর মধ্যে লোক আছে। সমস্ত শক্তি দিয়ে অনুপম তার হাতখানি বাইরের দিকে বার করে দিল।

একটা টর্চের আলো হাতের উপর পড়লো—আরো কণ্ঠস্বর শোনা গেল ঃ বার কর বার কর—একটা ছেলের হাত দেখা যাচ্ছে।

তারপর কিছুক্ষণের খবর জানে না, অনুপম।

চোখ চেয়ে দেখলো একটা বাড়ীর রোয়াকে শুয়ে আছে সে আর জলের ঝাপটায় তার দেহ ভিজে গেছে! এখন আর অত ভয় করছে না। কাছেই ওল্টানো গাড়ীটা দেখে অনুপম বললেঃ ওর মধ্যে আর একজন ছিল যে···?

—আর একজন মানে ড্রাইভার তো? সে চম্পট দিয়েছে তৎক্ষণাৎ। ভীড়ের ভিতর থেকে কে বলে উঠলো।

—না, না, আমার মত আর একটা ছেলে—আর্তনাদ করে উঠলো অনুপম।

যারা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তারা বললে, অসম্ভব আর বার করা। যদি থাকেও সে বেঁচে নেই—কোন ভিতরে ঢুকে মরে গেছে নিঃসন্দেহে!

অনুপমের চোখ দু'টো বড় হয়ে উঠলো আতঙ্কে।

ভীড়ের লোকেরা আবার চেষ্টা চরিত্র করলো ঘণ্টাকয়েক ধরে! তারপর অনেক কেটে যাওয়া ছড়ে যাওয়া রক্তপড়া অচৈতন্য দেহটাকে টেনে আনলো রোয়াকের উপর—কোনো সাড়া নেই। অনেকক্ষণ পরে নিঃশ্বাস পড়লো তার। হাঁ বেঁচে আছে।

এবার অনুপম বাড়ী যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। একজন বললেনঃ ব্যস্ত হয়ো না খোকা খুব জোর বেঁচে গেছ, তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দেওয়া হবে এখনি।

বাড়ী অনুপম পৌঁছল রাত তখন বারোটা। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা একটা কথা আছে। রাস্তার য়্যাক্সিডেণ্ট অতএব পুলিশ এলো, আবার ট্যাক্সি এলো—চল হাসপাতাল। সেখানেও কত রকমের পরীক্ষা, কত লেখালেখি তার আর সঙ্গের ছেলেটির। তরাপর তো মুক্তি পাবে।

বাড়ীর সামনে রাস্তায় আর ঝুল বারান্দায় সবাই দাঁড়িয়ে। এর মধ্যে সম্ভাব্য সব জায়গায় খবরাখবর করা হয়ে গেছে, হাসপাতালে ফোন সুরু হয়েছে। মায়ের চোখ ভারী, আর সকলের মুখ আমসী হয়ে গেছে। কেউ বলতে পারে না অনুপমের খবর।

সমস্ত আশা যখন ছেড়ে দেবার মত তখন ফেট্টি জড়ানো অনুপম

আর ছোকরাটি নামলো। সকলকে দেখে অনুপম কেঁদে ফেললো—মা ছুটে এলেন, মাকে জড়িয়ে ধরে ফোঁপাতে লাগলো।

সব কথাই সকলে শুনলেন। মাসখানেক ভোগান্তির পর সে যেদিন আবার স্কুলে গেল সেদিন তুলসীতলায় হরির লুঠ হলো, সকলে পূজোর সন্দেশ খেলো।

স্কুল যাবার সময় মা বললেন, সাবধানে যেও—যেখানেই যখন যাও মাকে বলে যেতে হয়—মার কথা না শুনলে…

অনুপম জোর দিয়ে বলে উঠলো, আর হবে না মা, সব শুনবো, তোমায় না বলে কোথাও যাব না।

তাতো ঠিক, কিন্তু তাবলে মনে সাহস রাখা উচিত, আর য়্যাক্‌সিডেণ্ট দেখে ভয় পাওয়া উচিত নয়। নিজের হলেও ধৈর্য্য হারাতে নেই—বাবা বলে উঠলেন।



ঘটনাটা বলি

মা একদিন দুদ্দাড় করে প্রহার দিলেন চন্দনকে। মার সেদিনের চেহারা দেখে বাড়ির বড়রা পর্যন্ত ভয় পাচ্ছিলেন। আর ছোট্কা যদি টেনে না আনতেন তাহলে সেদিন চন্দনের অবস্থা আরো কি হতো বলা যায় না।

ঠাকুমা চন্দনের গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—ইস্, একেবারে চোরের ঠ্যাঙানো করেছে বৌমা। বাবাঃ, এত রাগ! আর দাদু, তুমি যে কেন কথা শোননা, মা কতদিন বারণ করেছে···সারা শরীরের একি হাল হয়েছে বলো তো?

পাখার রেগুলেটারটা একটু জোর করে দিয়ে ছোট্কা বললেন: থাকগে থাকগে ওসব কথা এখন। ওকে চুপ করে শুয়ে থাকতে দাও। কিছুক্ষণ পরে দেখব ওষুধ-টষুধ দরকার হবে কিনা।

চন্দ্রা গালে হাত দিয়ে ঘরের কোণে চুপ করে বসেছিল—মার এরকম চেহারা সে কখনও দেখেনি। ছোটভাই চন্দন, সে সকলের

আদরের আর মা'র কাছে তো কথাই নেই। তাকে এত··হ্যাঁ, মা কিছুদিন থেকে এক কথা বলছেন আর সে শুনছে না, তা সে লক্ষ্য করছে। আর চন্দনের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে আসছে চন্দ্রা শুনেছে বৈকি !

স্বভাব বদলাতে পারে না চন্দন ! স্কুলের বা খেলার বন্ধুরা যারা চন্দনের কাছে আসে—তাদের যার যা ত্রুটি আছে তা নিয়ে সে দেখায়। সঞ্জু একটু তোতলামো করে কথা বলতো—সঞ্জুকে দেখলেই চন্দন তো-তো করে কথা বলতে সুরু করে। দীপু একটু টেনে হাঁটে—দীপুকে দেখলেই চন্দন খোঁড়াতে আরম্ভ করবে। কথা শেষ করে নীরু মুখের হাঁ বন্ধ করে না। নীরু এলেই চন্দন নিজের মুখের হাঁ বন্ধ করে না। তোলা-ঝি বাসন মাজতে আসে, তার ঘ্যানঘেনে মেয়েটা এসে পিছন পিছন নাকে কাঁদে খাবার জন্য —সেদিন চন্দন যেই দেখলো মেয়েটাকে, পরের দিন অমনি শুরু করলো প্যানপ্যানানি। মেয়েটা আরো জোরে চিৎকার করে। ঝি একদিন মার কাছে অভিযোগ জানালো—বকুনিও খেল চন্দন, কিন্তু কিছুতেই বন্ধ করলো না।

এই অভ্যাস শুধু নয়—কারুর কিছু বিপরীত দেখলে, ভুল কথা কেউ বললে সেইখানে দাঁড়িয়ে চন্দন হেসে গড়াগড়ি দেবে—এমন হাসে যে, সেখানে বড়রা যাঁরা থাকেন তাঁরা পর্যন্ত লজ্জিত হয়ে ওঠেন, বারণ করলেও শোনে না। সঞ্জু, দীপু, নীরু কাঁদো কাঁদো হয়ে কতদিন বলে গেছে : দেখ কাকিমা, চন্দন আমাদের এই রকম করে···। মা রাগ করে চন্দনকে বকেছেন, অভদ্র হলে ভদ্র বলে পরিচয় দেওয়া যায় না, স্কুলের মাষ্টারমশাইকে বলে দেবেন—এ সব বলে কোন ফল হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে এই রকম চলছে, আজ একেবারে মার সহ্যের সীমা অতিক্রম করলো। ছেলে বড় হচ্ছে, লেখাপড়া শিখছে, পাঁচজনের সঙ্গে মিশছে আর এমন অভদ্র হয়ে উঠছে ? মা সেদিন প্রচণ্ড রেগে গেলেন—ধৈর্যের বাঁধ রইল না।

খাটে শুয়ে থাকা ভাই-এর দিকে তাকিয়ে চন্দ্রা ভাবছিল—মা

তো কত ভালো, বেশি জোরে কথা বলেন না, মার সব কাজ, সব কথা সুন্দর, নিজে কত পরিচ্ছন্ন থাকেন—তারাও যাতে থাকে সে সম্বন্ধে কত সাবধান করেন—মার কথা শুনতে ভালো লাগে। যখন গল্প বলেন আরো সুন্দর লাগে। ঠাকুমা আর বাড়ির ছোট-বড় সবাই মার প্রশংসাই শুধু করেন না, কী ভালই যে বাসেন। শুয়ে শুয়ে মার ঘুমপাড়ানী গান শোনে তারা। সে সব নাকি মায়ের লেখা। মা আবার কত কি লেখেন—মার যে সবটাই ভালো। তবে আজ মা এমন ক্ষেপে উঠলেন কি করে? তবে চন্দনটা বড্ড অসভ্যতা করে সত্যি, কিন্তু মার এরকম চেহারা সে আর কোনও দিন দেখেনি—না দেখলে কেউ বিশ্বাসই করবে না···।

আর চন্দন চিৎ হয়ে শুয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ কেমন যেন কি ঘটে গেল! এরকম তো হয়েই থাকে—ঝি'র ঐ প্যানপ্যানানি মেয়েটা, ওটাই তো সব গণ্ডোগোল বাধিয়ে দিলে—যেমনি ওকে ভেঙানো—কোথায় যে ছিলেন মা···উঃ! বড্ড ব্যথা, চোখ বন্ধ করলো চন্দন—মাথার ভিতর যেন কেমন করছে। ঠাকুরমার গায়ে হাত বোলানোও ভাল লাগছে না, বড্ড যেন ব্যথা শরীরে। ওঠাও যাচ্ছে না, এখনি যদি বন্ধুরা খেলতে আসে আর শোনে আমি শুয়ে আছি, সে কী লজ্জার কথাই না হবে—যত দোষ ঐ প্যানপ্যানানি মেয়েটার। ওর মা বলেঃ আমরা গরীব লোক, তুমি মেয়েটারে অমন করো কেন? ওর বাপ নেই, ভালো খেতে-পরতে দিতে পারি না, তোমরা তার কষ্ট কি বুঝতে পারবে? পটার মা কি যে বলে। আচ্ছন্ন হয়ে এসব ভাবছিল চন্দন।

—পটার মা কি বলে? প্রত্যেক মানুষকে তুমি ভেংচি কাটো, কার মনে কি কষ্ট দিচ্ছ বোঝ না, বড়রা বললেও শোনো না, আবার নিজের দোষ ঢাকবার চেষ্টা হচ্ছে। দুষ্টু ছেলে কোথাকার!

চন্দন বলে উঠলো—কে, কে কথা বলছো?

বিদ্রুপের স্বরে আবার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—কে বলছি? আমি অভদ্র অভব্য ছেলেদের ওষুধ জানি। আজ যা তোমার

হয়েছে তা কিছুই নয়। মা'রা যত রাগ করেই মার দিন, তা খুব কষ্টের নয়। কিন্তু তুমি যা অসভ্য তৈরী হয়েছ তাতে তুমি তো আরও বেশি শাস্তি পাবে তোমার বন্ধুর দল থেকে। শুধু অন্যের মনে কষ্ট দিয়ে তুমি রেহাই পাবে নাকি? জানো, তোমাকে আমি কি শাস্তি দেবো—এই চুলের মুঠি টেনে নিয়ে—

—আহা-হা লাগে, লাগে—বলতে বলতে চন্দনের মনে হলো তার চুল ধরে কে যেন জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে শূন্যে নিয়ে ছুটছে। ইস্! এখনি ছেড়ে দিলেই ঢুম করে কোথায় পড়বো, হাত-পা ভেঙে—ভাবতে ভাবতে বলে উঠল চন্দন—শোনো না, আমার কথা একটু শোনো—

—তুমি কি কারুর কথা শুনেছ? এমনি কি মার কথা পর্যন্ত নয়। মার মত আর কেউ নেই পৃথিবীতে—সেই মায়ের কথাও শোন না—আবার বল লাগছে? চল, চল, কি করি তোমায় দেখ।...

চীৎকার করে উঠলো চন্দনঃ না না আর করবো না, মার কথা শুনবো, অভব্য হবো না—উঃ, কি ব্যথা সারা শরীরে—মা, মাগো!

আচ্ছন্ন ভাবটা কমে গেছে চন্দনের—মাথায় তো এখনও কার স্পর্শ পাচ্ছে, তবে অত কঠিন স্পর্শ নয়—কার যেন নরম ঠাণ্ডা হাত ব্যথার স্থানে ধীরে ধীরে বুলিয়ে দিচ্ছে।

একটা ছোট্ট আবছায়া স্বপ্ন দেখেছে বলে মনে হলো চন্দনের।

চোখ চেয়ে তাকালো চন্দন—নরম অন্ধকার ঘর-ভর্তি। নীল আলোটা জ্বলছে, তার নীচেই স্বামীজীর ছবি, সকালে উঠে মা প্রণাম করেন।

—মা, মাগো আর করবো না।

মাথায় হাত বোলাচ্ছেন মা। বললেনঃ আমি জানি চন্দন তুমি আর করবে না। কাল বন্ধুদের সঙ্গে পটার সঙ্গে ভাব করে নেবে—কেমন?

—হ্যাঁ নেবো—বলে হাত তুলে স্বামীজীর ছবিতে নমস্কার করলো।

চন্দ্রা অবাক হয়ে দেখলো, মা চন্দনকে আদর করে বলছেন লক্ষীছেলে আমার।



পিকনিক

ব্যাপারটা কি হলো শোনো। গোবিন্দর মামা ছিলেন ভারী কৃপণ অথচ ভদ্রলোকের টাকার আদি অন্ত ছিলো না। সংসারে তাঁর কেউ নেই কেবল তাঁর বোন অর্থাৎ গোবিন্দর মা আর গোবিন্দ। গোবিন্দর বাবা ছিলেন না তাই মা গোবিন্দকে নিয়ে ভায়ের বাড়ী এসেছিলেন যদিও তাতে খরচপত্র বাড়বে তবুও গোবিন্দর মামা খুব আপত্তি করেননি কারণ তাঁর বাড়ীতে কেউ নেই আর বুড়ো হয়েছেন। সেইজন্য বোন আর ভাগ্নেকে রাখতে আপত্তি হয়নি। চোখে ভাল দেখেন না, আর কানেও শোনেন না—চীৎকার করে কথা বলতে হয়। কিন্তু তবুও টাকা খরচ করে চিকিৎসাও করতে চান না। বেশ ভাল করে ওষুধ পথ্যিও করেন না। সেই যে গল্প আছে একদিন কুচো চিংড়ীমাছ এনে ঝোল রেঁধে আবার মাছগুলি তুলে নিয়ে পরেরদিন ঝোল রান্না হয়—এইভাবে পরপর ক'দিন চালাবার পর যখন গন্ধ হয়ে যায় তখন আর চলে না। গোবিন্দর মামা প্রায় এইরকম মানুষ। খাওয়া দাওয়া যাই হোক গোবিন্দর মা বুদ্ধি করে চালান—

গ্রামের বাগানে তরীতরকারী, আর পুকুরে মাছ, ধান চালও সকলের কিছু না কিছু আছেই—তাই মামা অত কৃপণ হলেও খুব একটা কষ্ট হয় না। কিন্তু যদি কেউ চাঁদা চাইতে আসতো বা দান করতে বলতো তখন রেগে একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যেন ছিটকে পড়তেন। একটি পয়সা দেওয়া দূরের কথা এমন কথা বলতেন যে তারা আর এ বাড়ীর ধারে কাছে আসতো না। পাড়ার সকলেই মামার উপর খুব খাপ্পা ছিল—বলতো বুড়ো মরে যখ হয়ে ওর টাকা আগ্‌লাবে। কিন্তু এসব কথা কে শুনছে। মামা তাঁর হিসাব থেকে একচুল এদিক ওদিক নড়ছেন না। তাছাড়া কানে কম শোনার একটা সুবিধেও পেয়ে গেছেন।

এহেন মামার কাছে চাঁদা চাও, দান চাও কিছুতো পাবেই না। ছোটরা এলে তেড়ে আসবেন বড়রা এলে রেগে চারটি কথা শুনিয়ে দেবেন।

এই মামার কাছে কিছু আদায়ের ফিকির খুঁজতে লাগলো গোবিন্দর স্কুলের সহপাঠীরা। অবশ্য তারা পরামর্শ করলো গোবিন্দকে তারা আগে কিছু বলবে না কি জানি যদি মামাকে সাবধান করে বা সব ফাঁস করে দেয়।

মানিক একদিন বললে : দেখ ভাই কাঁহাতক এই অস্তি গোদাবরী তীরে। আর এই একঘেয়ে ক্লাস করা যায়?

গণেশ বললে : তা বলে ক্লাস পালাবি কেন?

বিনয় বললে : তুই গোবর গণেশ যা পণ্ডিতমশাই বলেন তাই ঠিক—ওকি প্রতিদিনের কথা বলেছে। একদিন কিছু মুখ বদলানো। চোখ বদলানো।

অমিয় বললে : গণেশের তো মুখ বদলানো প্রায়ই হয়—সেদিন মর্তমান কাঁদিতে নজর দিয়েছিল আর পড়বি তো পড় পণ্ডিতমশাই এর চোখে—আর সঙ্গে সঙ্গে—কে-রে রাম গণ্‌শা বুঝি?

সকলে একসঙ্গে বললে : তারপর আর কি? পেছন ফিরে ভোঁ দৌড় দিলাম—কোনো দিকে তাকাইনি—পায়ে যা লেগেছে।

—পরের গাছের কাঁদি চুরি করতে গেলে—

ধমক দিয়ে গণেশ বললেঃ রাখ, রাখ। পণ্ডিতমশাই-এর কে আছে? প্রাণ ধরে কাউকে দেবে না। নিজেও খাবে না, কেবল আগ্‌লাবে।

মানিক বড্ড সোজা কথা বলে, চট করে বলে ফেললোঃ ঠিক গোবিন্দর মামার মতো।

মুখ লাল করে গোবিন্দ মানিকের দিকে তাকালো।

রমেশ সামলে নিয়ে বললেঃ ওসব কথায় আমাদের কাজ কি? এখন আমরা একটা চড়িভাতি করবো তার ব্যবস্থা করতে হবে। চড়িভাতি মানে পিকনিক।

বিনয় বললেঃ তার জন্য টাকা চাই তো। আমাদের এক টাকা, আট আনা চাঁদায় তো হবে না।

মানিক বললেঃ রামঃ—সে আবার চড়িভাতি নাকি—তাতে তো রাস্তার ফেরিওয়ালার ঘুগনী হয়।

—তাই তো বলছি, টাকা কোথায় পাওয়া যাবে।

মানিক বললেঃ বুদ্ধি বার করতে হবে। আচ্ছা গোবিন্দ তোর মামাকে বললে হয় না?

—ওরে বাবাঃ, আমি ভাই ওসবে নেই। চললাম।

কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই গোবিন্দ জোরে জোরে পা চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গণেশ সেদিকে তাকিয়ে বললেঃ দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি। তারপর গলার আওয়াজ নামিয়ে ফিসফিস করে অনেকক্ষণ কথা বললে সকলের সঙ্গে।

সবাই ঘাড় নাড়তে লাগলো। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হবার পর গণেশ বললে বেশ তাহলে এখন জিজ্ঞাসা করি—তোমার নাম কি?

—মহাদেব ওঝা।

সুনীল! তুই জমাদার! বিনয় তুই কনেষ্টবল।

রমেশ বললেঃ সব ঠিক আছে—কেবল কাপড়-চোপড়গুলো—।

বাধা দিয়ে গণেশ বললেঃ সে সব যোগাড় হবে। তাহলে কাল

এগারটায় চৌধুরীদের বাগানে সকলে জিনিসপত্র নিয়ে রেডি থাকা হচ্ছে তো !

নিশ্চয় ! নিশ্চয় !! কোরাসে সব বলে উঠলো।

যথাসময়ে এক এক করে চৌধুরীদের বাগানে সব জড় হয়ে কাপড় চোপড় বদলে নিলো।

বিনয় বলছে—সরস্বতী পূজোর সময় আমরা যেমন থিয়েটার করি এও সেই রকম মনে হচ্ছে, এই সব সাজগোজ দেখে। কেবল অন্ধকার আর লোকজন নেই। গণেশের মাথায় যা সব বুদ্ধি আসে দেখা যাক আমরা উতরে দিতে কিনা। আসবার সময় মা বলেছিলেন এত রাতে আবার গণেশের বাড়ী নেমন্তন কি ? সকাল সকাল গেলে কি হতো। বললাম কিছু ভেবো না মা, পড়াশুনো সেরে সবাই আসবে। কাল তো রবিবার—একটু দেরী হলে ক্ষতি কি ? হরিকে বলো দরজার কাছে শুতে, যাতে আমি ডাকলেই শুনতে পায় দরজা খুলে দেয়।

সুনীল বললে : সবার বাড়ীতে একই অবস্থা ! কত মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে যে। খুব খারাপ লাগছে।

গণেশ বললে : এই মিথ্যেতে কারুর অনিষ্ট হচ্ছে না, বরং মজাটা শেষ হলে বাড়ীতে বলবো। আগে মাকে বলবো তারপর বাবাকে।

বিনয় বললে—হ্যাঁ সেই ভালো ! এখন চল ! বেশি রাত হলে বাড়ীতে বকুনি আছে।

গণেশ বললে : গোবিন্দর মামা তো শুয়ে পড়েন সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে। গোবিন্দ পড়াশুনো সেরে বড় জোর ন'টা। ওদের বাড়ী এখন নিশুতি। চল আমরা যাই—টর্চ আছে তো ?

—ইয়েস স্যার—সুনীল বলে উঠলো।

বিনয় বললে : এই ডাকাতদের কেউ ধরতে আসাবে না চট করে। কেননা কাছে পিঠে বাড়ী নেই। গোবিন্দর মামার ভয় কাছে পিঠে কেউ থাকলে ওঁর টাকাকড়ি চুরি হয়ে যাবে।

সকলে মিলে গোবিন্দদের বাড়ীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

দীনেশ বললেঃ বেশি চেঁচামেচি করিস না, অন্য লোকেরা এসে পড়বে। তারপর দরজায় টোকা দিতে লাগল। ভিতর থেকে গোবিন্দর মা বললেন, কে?

দীনেশ বললেঃ বাড়ীর পুরুষদের ডেকে দিন। আমরা থানা থেকে আসছি।

ভয়ে গোবিন্দর মার গলা জড়িয়ে এসেছে। বলছেনঃ এই মামাকে ডাক—কি বলছে থানা থেকে আসছে।

ওরে বাবা, আমি পারবো না—গোবিন্দর ভয়ার্ত স্বর শোনা গেল।

তখন তার মা-ই ভাইকে ডেকে এনে দরজা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়ালেন।

মানিক গলা নামিয়ে বললে—এই গণ্‌শা, টর্চের আলো ফেল মুখে। বোকা কোথাকার।

গণেশ টর্চ চারদিকে ঘোরাতে ঘোরাতে বললে আমরা থানা থেকে আসছি, পুলিশের লোক—কতকগুলো চোরাই মাল আপনার ঘরে আছে—আর তার সঙ্গে আপনি আর আপনার ভাগ্নে যুক্ত আছেন।

গোবিন্দ বলে উঠলোঃ পুলিশ? চোরাই মাল? সে আবার কি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ পড়ে ভেবো এখন জিনিসপত্র দেখবো ভিতরে চলো। এই মহাদেব!

—জী হুজুর।

—সার্চ সুরু করো। এই যে এত বড় ভোজালি…।

গোবিন্দ বললেঃ এত বড় কোথায়—আর ওটা ভোজালী কেন হবে? ওটা আমার পেন্সিল কাটা ছুরি।

গণেশ ধমক দিয়ে বললেঃ চুপ করো ছোক্‌রা! আমায় ছুরি চেনাতে এসেছ? এখনি অ্যারেষ্ট করে নিয়ে যাবো।

মামা সব দেখছিলেন, কোন ফাঁকে কথাটাও কানে গেছে। বললেনঃ কি হয়েছে? থানা, পুলিশ এই রাতে। ওসব বাপু ছাড়ো, কিছু জামিন নিয়ে রেহাই দাও। বুড়ো মানুষ, বাড়ীতে কেউ

নেই। ও ছোট ছেলে।

মানিক বললেঃ ছোট ছেলে আর আপনি বুড়ো মানুষ সব মাপ হবে? তা হবে না বুঝলেন? ভাগ্নেকে দিয়ে এসব চুরি-জোচ্চুরী করাবেন না আর।

মামা থতমত খেয়ে বললেনঃ সব কথা বুঝতে পারছি না, দোহাই বাবা রেহাই দাও।

গণেশ এগিয়ে এসে বললেঃ এখন রেহাই? আচ্ছা তাহলে—

মামা বললেনঃ ঠিক আছে কিছু নিয়ে ছেড়ে দাও। হতভাগা গোবনে কি যে করে।

—আনুন একশো টাকা।

মামা ঠক ঠক করে কেঁপে চোখ কপালে তুলে বললেন—একশো টাকা! কি বলছেন।

—তাহলে বাধা দিচ্ছেন কেন? এই সব ঘরের মধ্যে ঢোকো—যা আছে টেনে বার করো।

—না, না, ঢুকবেন না, দিচ্ছি, হতচ্ছাড়া গোবনে, আমার সর্বনাশ করলো। কিন্তু··· মামা একেবারে ক্ষিপ্ত হয়েছেন।

—কিন্তু বলছেন কেন? আমরা তো কাজ করতেই এসেছি।

—না, না, দাঁড়ান দেখছি··· মামা ঘরে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ পরে গোবিন্দর চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার করতে করতে এলেন টাকা নিয়ে।

খপ করে টাকাটা হাত থেকে নিয়ে গণেশ ইসারা করতেই সবাই বেরিয়ে পড়ল। গণেশ নমস্কার করে বললে, কিছু মনে করবেন না, ঘুমের ব্যাঘাত করলাম।

সে রাতে মামা আর ঘুমোতে পেরেছিলেন কিনা জানি না।

পরের দিন স্কুলে সকলের সঙ্গে দেখাশোনা হলো। গণেশ বললেঃ গোবিন্দ, রবিবার নদীর পাড়ে আমরা চড়িভাতি করবো আসিস। তোকে চাঁদা দিতে হবে না।

গোবিন্দ শুকনো মুখে বললেঃ আর চাঁদা!

রবিবার আয়োজন দেখে গোবিন্দ অবাক। বললেঃ এত কাণ্ড করেছিস—কি করে অত চাঁদা উঠলো? গণেশ বললেঃ গোবিন্দের

দয়া। মানে ঠাকুর গোবিন্দ বা তুই ঢোল গোবিন্দ যা হয় ধরে নে।

—সে আবার কি?

—তাহলে ওসব কথা ছাড়—পেট ভরে খেয়ে নে—বরং তোর ঐ কৃপণ মামার জন্য কিছু নিয়ে যা।

—আর মামা! আমার উপর যা রেগে আছেন—তারপর আবার টাকা খরচ হয়েছে বেজায়।

সকলে মুখ টিপে হাসলো। তারপর হৈ-চৈ করে খাওয়া-দাওয়া হলো—প্রচুর আয়োজন—খেয়ে ফুরোতে পারা যায় না। প্রত্যেক ছেলের বাড়ীতে এক থালা করে খাবার পাঠানো হলো।

গোবিন্দর মামার কাছে গণেশ নিজে গেল—খাবারের পাত্র রেখে নমস্কার করে বললেঃ আপনার দয়াতে আমরা আনন্দ করলাম, পেটপুরে খেলাম—আপনিও একটু খান।

—তার মানে? রুক্ষস্বরে মামা বললেন।

—এই মানে সেদিন রাতের ঘটনা। গোবিন্দ আমাদের খুব ভালো ছেলে—চুরি-চামারির ধার ধারে না—কিন্তু তাকে না ধরলে আপনার কাছ থেকে টাকা—মামা লাঠি নিয়ে তেড়ে আসতেই গণেশ হাওয়া হয়ে গেল।

সকলের অভিভাবকরা এক সময় সব জানতে পারলেন। বকুনীও কিছু খেলো সবাই। তবে বড়রা মুখ টিপে হাসলেন—গোবিন্দর মামার অবস্থা ভেবে যেন একটু খুসীই মনে হলো।



গল্পের মত

কাবুল দেশের বাসিন্দা বসির মহম্মদ। মাথার লম্বা চুল পাগড়ীতে সব ঢাকা পড়ে না, চুলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লম্বা দাড়ি, পরনে ঢিলেঢালা জোব্বা, গায়ে ছোট কুর্তা—হাতে পাকা বাঁশের লাঠি। পিঠে মস্ত বোঁচকা, ক'জনেই বা তার নাম জানে? সবাই বলে কাবুলীওয়ালা—নাম নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

বয়স হয়েছে বসির মহম্মদের। লম্বা মজবুত শরীরখানা যেন একটু ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। চোখের দৃষ্টিও আগের মত প্রখর নয়। আগে দূর থেকে মাঠ-ভর্তি জনতার মাঝখান থেকে যাঁর খোঁজে অতখানি পথ এসেছে, তাকে খুঁজে পেতে একটুও ভুল হতো না, কিন্তু আজকাল কাছের মানুষকেও চিনতে কষ্ট হয়। তবু বয়সকে গ্রাহ্য করে না বসির মহম্মদ। বর্ষা ঋতু শেষ হতে না হতেই কাবুল থেকে পাড়ি দেয় ভারতবর্ষের দিকে। অভাবগ্রস্ত দরিদ্র

মানুষদের সঙ্গে তার কারবার। চড়া সুদে টাকা ধার দিয়েই সে বছরের পর বছর নিজের টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে চলে। টাকা বাড়ানোর নেশায় দিনরাত মশগুল।

সেবারও এসেছে বসির মহম্মদ। তখন রেলগাড়ির তেমন চলন হয়নি—দু'খানি পা আর মোটা লাঠিখানার উপর নির্ভর করে ঘুরে বেড়াতো পাঞ্জাবের গাঁয়ে গাঁয়ে। বস্তির কুকুরগুলো দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে সোরগোল তুলতো—ছেলেরাও খেলা ভুলে তাকিয়ে থাকতো তার দিকে। কারুর চোখে বিস্ময়, কারুর ভয়। কেউ বা হেসে গড়িয়ে পড়তো, কারু মুখে চলতো আলোচনা। তাদের কথা বুঝতো না বসির, তবে আলোচনা যে তাকে নিয়েই, সেটুকু তার জানা ছিল। তবু কোনও দিকেই ভ্রুক্ষেপ ছিল না তার।

সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে বসির বেশ ক্লান্তি বোধ করছিল। সন্ধ্যে হতেও আর বাকি নেই, দূরে শহরের আলো দেখা যাচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পা চালিয়ে বসির এসে পৌঁছুল শহরের উপকণ্ঠে বান্নু শহরে। আরো কতবার এসেছে এই শহরে। রাস্তাঘাট বাজার হাট সবই তার চেনা। এইখানেই রাতটুকুর মত বিশ্রাম নেবে স্থির করলো বসির। সঙ্গে সামান্য যা কিছু আহার্য ছিল তার সদ্ব্যবহার করে, এক বাগানবাড়ির পাঁচিলের বাইরে দেখতে পেলো একটি প্রকাণ্ড গাছ। তার ঘন পাতার মাথার উপর সুন্দর একটু আচ্ছাদন। হোটেলে গিয়ে অনর্থক পয়সা খরচ না করে রাতটুকু এই গাছের তলায় কাটিয়ে দেবে—এই তার ইচ্ছা। ইচ্ছা পূরণে কোনো বাধাই ছিল না, কারণ আরো জনকতক পথিক এ জায়গাটিকে বেছে নিয়েছিল রাতের আশ্রয় হিসেবে। সুতরাং একলা নির্জন জায়গায় রাত কাটাবার ভয় নেই। সারাদিন খাটুনি আর পথ চলার ক্লান্ত দেহ নিয়ে বসির মহম্মদ গাছের তলায় শুয়ে পড়লো। একপাশে তার বোঁচকা আর এক পাশে লাঠিগাছা। ক্লান্ত শরীর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমের হাতে সঁপে দিল নিজেকে। রাত শেষ হবার আগেই ঘুম ভাঙলো যখন বসিরের, তখনও সূর্যের

আলো ফোটার দেরি আছে। কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা করতে রাজী নয় সে। বেলা বাড়বার আগেই তাকে পৌঁছতে হবে ছ'মাইল দূরের গ্রাম—যেখানে আছে দু'ঘর দেনদার। দেরি হলে হয়তো বাড়ীর বার হয়ে যাবে তারা। অন্যদের ঘুম ভাঙবার আগেই বসির তার গালপত্তর নিয়ে খোদাতাল্লার নাম স্মরণ করে স্থান ত্যাগ করলো।

অর্ধেক পথ পেরিয়ে যাবার পর তার হঠাৎ খেয়াল হলো, তাইতো আসল জিনিসটাই যেন ফেলে এসেছি মনে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি বোঁচকা খুলে দেখলো যা ভয় হচ্ছিল তাই সত্যি হয়েছে। তাড়াহুড়ো করে রওনা হবার সময় টাকার থলিটাই ফেলে এসেছে সেখানে। একটি দু'টি হাজার নয়, পাঁচ হাজার টাকা—মাথার চুলগুলো সোজা হয়ে উঠলো তার, বুকের ভিতর ঢিপঢিপ করতে লাগল। গন্তব্যস্থানের দিকে আর না এগিয়ে সে ফিরে চললো বান্নু শহরের দিকে। জীবনের সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে ছুটে চললো বসির।

শহরের কাছাকাছি এসে পড়েছে বসির, ঐ তো দেখা যাচ্ছে ঝাঁকড়া মাথা গাছ, লোকজন সব জেগে উঠেছে, যার যা কাজ তাই নিয়েই সবাই ব্যস্ত। বছর পনেরোর একটি ছেলে রাস্তার পাশে মাঠে গরু চরাচ্ছিল। শতছিন্ন কাপড় দিয়ে কোনরকমে ঢাকা তার শীর্ণ দেহখানি। কিন্তু চোখে-মুখে তার বেশ সপ্রতিভ ভাব। কাবুলীওয়ালাকে ছুটতে দেখে ছেলেটি বলল : খাঁ সাহেব, ওরকম পড়ি-কি-মরি করে এত ভোরবেলায় ছুটছো কেন? ছেলেটির কথায় একটু সহানুভূতির আঁচ পেলো বসির। দৌড়ঝাঁপ থামিয়ে দাঁড়িয়ে বলল : কী বলবো ভাই আমার নসিবের কথা, ভোর রাত্তিরে ঐ গাছতলায় ফেলে গিয়েছি আমার টাকার থলি—যথা এবং সর্বস্ব তাতে—আর কী পাবো?

ছেলেটির ঠোঁটের কোণে একঝিলিক হাসি। সে বলল : হক্-এর ধন খোওয়া যাবে কেন? তারপর প্রশ্ন করতে লাগলো কী রকম থলে? কত বড়? কি দিয়ে তৈরী সে থলে? কোন্ রঙ থলের? মনে মনে বিরক্ত হলেও বসির জবাব দিল সব ক'টি প্রশ্নের। ছেলেটি

বলল ঃ বুঝতে পেরেছি তুমিই সেই থলের মালিক, এসো আমার সঙ্গে।

গাছের অদূরে ছিল ঝোপঝাড় অঞ্চল। সেইখানে দাঁড়িয়ে ছেলেটি মাটি খুঁড়ে বার করে দিল সেই হারানো থলেটি, পুরো টাকা ভর্তি।

বসিরের মুখে কথা নেই, চোখ ভর্তি জল। ছেলেটি বলল ঃ সকালবেলা যখন গরু নিয়ে যাই তখন গাছতলা দিয়ে যেতে চোখে পড়লো থলেটি—দেখলুম, তাতে টাকা ভর্তি! আমি গরীব মানুষ কোথায় রাখবো অত টাকা? কার টাকা তাই বা জানবো কী করে? কার কাছেই বা বিশ্বাস করে অত টাকা গচ্ছিত রাখবো? তাই ভেবে এইখানে মাটির তলায় পুঁতে রাখলাম। যারই হোক, তার দেখা যদি কোনদিন পাই, তাকেই ফিরিয়ে দেব সব টাকা। এই কথা ভেবে তাইতো ওখানে পুঁতে রেখেছিলাম।

এতক্ষণে বসির মহম্মদের মুখে কথা ফিরে এসেছে। থলেটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে বলল ঃ বেটা, তোমার জন্যই ফিরে পেয়েছি আজ আমার সারা জীবনের সঞ্চয়। তোমার ঋণ কী দিয়ে শোধ করবো জানি না, এই পাঁচশো টাকা তুমি নাও, আমার ঋণের বোঝা হাল্কা করো।

ছেলেটি কিছুতেই নেবে না তার দান। খালি বলে, তোমার জিনিস তুমি ফিরে পেয়েছ এতে আমার বাহাদুরি কি? আমি কেন নেব তোমার টাকা।

বসিরও কিছুতেই ছাড়বে না, শেষ পর্যন্ত রক্ষা হলো। ছেলেটির কথায় বসির পোঁটলা খুলে দেখলো, কিসমিস, আঙ্গুর, পুঁতির মালা আরো কত কি!

কোনটাই তার পছন্দ নয়।

ঐ তো ঐ কোণে একটি ঝকঝকে কী দেখছি?

বসির বার করলো—ঝকঝকে জিনিসটি একটা দু'ফলা ছুরি। আনন্দের বিদ্যুৎ খেলে গেল ছেলেটির চোখেমুখে, বলল ঃ ঐটা দাও আমায়।

বসির মিঞা খুশী মনে ছুরিটি তুলে দিল ছেলেটির হাতে। অপলক দৃষ্টিতে ছুরির দিকে যতক্ষণ ছেলেটি তাকিয়ে ছিল, ততক্ষণ বসির মহম্মদ ভাবছিল মনে মনে—চার আনা দামের ছুরিটি আজ পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে বিকিয়ে গেল।



ভুল ভাঙলো

ঘুড়টা কেটে গেল।

সারা আকাশভরা ঘুড়ি উড়ছে। লাল, নীল, হল্‌দে, সতরঞ্চি। লেজের মত লম্বা কাগজের ফিতে ঝুলছে! ঘুড়ি কোন শূন্যে মিলিয়ে আছে কিন্তু লম্বা ফিতেটা বেশ দেখা যাচ্ছে। হাতের লাটাই নিয়ে ঘাসের উপর বসে পড়লো হীরক। ভাবতে লাগলো। কতই তো গল্প শুনেছে সে মার কাছে, এখন এমন কেউ বন্ধু থাকতো—সেই ঘুড়িটা এনে দিত তার কাছে। কিন্তু কি করে তা হবেই বা! তার তো কোনো বন্ধু নেই। ইস্কুলে, বাড়ীতে, পাড়ায় কোথাও না। মা কত রাগ করেছেন এজন্য।

এ আবার কেমন ছেলে যে একটাও বন্ধু থাকবে না। স্কুলের এক ক্লাশ ছেলে—সকলেই সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে, খেলছে, গল্প

করছে, বেড়াচ্ছে, পরস্পর পড়াশুনোর কথা বলছে। হীরক নিজের কানে শুনেছে ও চুপ করে থাকে বলে ছেলেরা তাকে শুনিয়ে কত টিপ্পনী কাটে। কিন্তু হীরকের ভালো লাগে না কি করবে? অনেক কথা অনেক হৈ-চৈ করার চেয়ে নিজের মনে পড়া করা, খেলা করা অনেক ভালো। বাড়ীতেও সে একা ছিল এতদিন। এই সেদিন একটা ছোট ভাই এসেছে তার নাম তিলক। একটু আধটু তার কাছে গেলেও হীরক একা থাকতেই ভালবাসে। তিলক যদি চেঁচিয়ে কাঁদে বা মাকে ডাকে—হীরকের একটুও ভালো লাগে না। খুব অসুবিধে মনে হয়। তার চোখের দৃষ্টি দেখে মা বলেন, তোমার মত একা থাকতে চায় এমন ছেলেমেয়ে আমি একটাও দেখিনি। একটা বন্ধু তো নেই, যদি বাড়ীতে কেউ আসেও তা তোমায় খুঁজে পাওয়া যায় না। এ আবার কি অসভ্যতা? আমরা তো মানুষ তাই স্বাভাবিকভাবে চলতে চেষ্টা করি। তোমার মত অস্বাভাবিক হবো কি করে? ভাই কথা বললে কপাল কুঁচকে ওঠে তোমার। তোমার কি বিশ্রী অভ্যাস? ভাল বন্ধু থাকা জীবনে খুব দরকার—বড় হলে বুঝতে পারবে। এমন একলা থাকা ছেলেমেয়েকে কেউ পছন্দ করে না। কিন্তু হলে কি হয়—এত কথা শুনে বকুনী খেয়েও হীরকের কিছুই হলো না। নিজের মনে নিজেই রয়ে গেল। ক্লাসের বিপুল আর পার্থ সেদিন মিহির আর সৌম্যকে বেশ জোরে জোরে বলছিল যাতে হীরক শুনতে পায়—উঁহু ওদিকে নয়, ওদিকে নয়—এদিকে আয়, কথা বললে বিদ্যা বেরিয়ে যাবে। আমরা তো ক্লাসের ওছা ছেলে—

আসলে বিপুল বেশ ভালই লেখাপড়ায়—কেবল হীরককে আক্রমণের জন্য এসব বলা।

ঘরে বাইরে স্কুলে একই কথা শোনে হীরক তবু তার একটাও বন্ধু নেই।

আশ্চর্য হয়ে যায় সবাই।

সেদিন কে যেন ডাকাডাকি করছে—বাবা বাড়ী নেই! হরিও দোকানে গেছে—মা বললেন: 'দেখ, কে ডাকছেন হীরক, ভালো করে জিজ্ঞাসা করে নাও!'

হীরকের উত্তর নেই, এক মনে ঘুড়ির কল বাঁধতে লাগলো, তাড়াতাড়ি বাঁধা হলে ছাদে চলে যাবে ব্যস, তাহলে এসব আর শুনতে হবে না।

মা বিরক্ত হয়ে নিজেই উঠে গেলেন। ফিরে এলেন যখন তখন খুব রেগে গেছেন

'এমন তো দেখি নি। একলা থাকতে ভালবাসে! যে কেউ এলেও কথা বলে না। মাসতুত পিসতুত ভাইরা বোনেরা আসছে, পাড়ার কত ছেলেমেয়ে আসছে কারুর সঙ্গেই ভাব নেই। খেলবার মধ্যে ঘুড়ি আর বই পড়া···এমন ছেলে দেখিনি। আমরা ছোট বেলায় মিশুক ছিলাম—বন্ধু-বান্ধব এলে গল্প ফুরোতে চাইতো না আমাদের···।'

এসব কথা শুনে শুনে তার মুখস্থ। কিন্তু তবু তার স্বভাব বদলায়নি। এখন পরীর মত বন্ধু ম্যাজিকের মত কাজ করে দেবে··· এসব ভাবলে কি হবে! হীরক ভাবছে কানে আসছে 'ভো-কাটা' শব্দ। হায় রে যদি একটাও বন্ধু থাকতো···ভাবতে ভাবতে চোখে জল এসে গেছে তার।

—এই নাও তোমার ঘুড়ি, কেটে গিয়ে আমাদের বাড়ী পড়েছিল। আরে ছিঃ! পুরুষ মানুষ হয়ে তোমার চোখে জল?

হীরক দেখলো ফুটফুটে একটা মেয়ে—নীল রং-এর ফ্রক—মাথার চুলে চকচকে মত কি পরা—কি চমৎকার সাজ—ঠিক একটা ছোট পরী। ওমা তাই তো পেছন দিকে আবার পাখা রয়েছে, বাতাসে ঝিরঝির করে কাঁপছে,—কী সুন্দর!—কে তুমি? আচ্ছা ধন্যবাদ ঘুড়ির জন্য, তুমি একটু বসো কথা বলি।

মেয়েটি ঠোঁট উল্টে বললে···তুমি তো কারুর সঙ্গে কথাই বল না, একটিও বন্ধু করো না, তোমার কাছে বসবো কি? আমাদের অনেক বন্ধু আছে, তারা খুব ভালবাসে। আচ্ছা যাই···বুঝলে?

হীরক বললে···আচ্ছা, একটু থাকো না, কথা বলি।

না, আমার আজ নিমন্ত্রণ আছে। কাল আসবো এই সময়।

পরী চলে গেল—সেই দিকে তাকিয়ে হীরক বললে—কাল ঠিক

এসো কিন্তু এখানে। তারপর ভাবলো ঃ সত্যি বন্ধু থাকা কি ভালো, এবার সে একা থাকবে না, সকলের সঙ্গে ভাব করবে, মিশবে, কথা বলবে। মা ঠিক বলেন—খুব অন্যায় হয়ে গেছে তার।

কিন্তু ভাবলে কি হবে? ঘুড়িটা হাতে পেয়ে খুশী হয়ে যা মনে হয়েছিল, মেয়েটি চলে যাবার পর আর তো মনেই রইল না। আবার ঘুড়ি ওড়াতে আরম্ভ করলো হীরক—সন্ধ্যা হবার আগে পর্যন্ত আকাশের গায়ে তার ঘুড়ি উড়তে লাগলো, প্যাঁচ খেলে কত ঘুড়ি সে কেটে দিল সুতোর মাঞ্জাও বেশ আছে মনে হচ্ছে!

হীরক ভাবছে সত্যি এত যে বকুনী খেতে হয় কথা বেশি না বলার জন্য, কিন্তু তার ভালো লাগে না। চুপচাপ কাজ করা ভাল লাগে। বন্ধু? বন্ধু না থাকলে কি হয়? তবে হ্যাঁ সাহায্য পাওয়া যায় তো বন্ধু থাকলে। যেমন ঘুড়িটা…

তোমার জন্য খেলা ছেড়ে চলে এলাম। বলেছিলাম আসবো, এই সময় তো আমরা ছুটে ছুটে খেলি।

হীরক বললে, তুমি কে? কোথায় থাকো? কি নাম তোমার?

মেয়েটি অবাক হয়ে বলল—ওমা তুমি কেমন ছেলে, কাল কত কথা হলো আর আজ চিনতে পাচ্ছ না? আমি তোমার পাশের বাড়ী থাকি। আমার নাম 'কথাকলি'।

হীরক আরো আশ্চর্য হয়ে বললে…পাশের বাড়ী থাকো, কই দেখিনি তো? আর কথাকলি কি নাম—সে তো নাচের নাম।

—তাও জানো দেখছি, হ্যাঁ আমার মা, আমার নাম রেখেছে কথাকলি। নাচতে জানি বৈকি! আর তুমি তো কাউকেই চেনো না।

—কাল তো তুমি আসো নি, সে তো পরীর মত মেয়ে একটা।

কথাকলি হেসে গড়িয়ে পড়লো—ওমা কি বোকা তুমি, কাল যে মিষ্টুর জন্মদিন ছিল, আমরা যার যা ইচ্ছা সেজেছিলুম—তাই পরীর মত দেখাচ্ছিল…। কাল কি মজা করলুম আমরা মিষ্টুর জন্মদিনে। তোমার তো একটাও বন্ধু নেই, কি করে বুঝবে বন্ধু থাকা কত ভালো, কি আনন্দ হয়।

হীরক একটু ভেবে বললে···হ্যাঁ বড্ড ভুল হয়ে গেছে ভাই—কথাকলি। আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু। আর তোমার মত সব ছেলে-মেয়ের সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব হবে—বুঝলে।

কথাকলি হেসে বললে···ঠিক বলেছ, আচ্ছা দাঁড়াও আমি ওদের সবাইকে ডেকে আনছি খেলবার জন্য।

ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো হীরক, বললেঃ কাকে ডাকবে? না, না, দাঁড়াও, দাঁড়াও—এখনি কাউকে ডেকোনা। কথাকলি বললেঃ তাহলে তো সবাই ঠিক কথা বলে। সেদিন আমি বলছিলাম তোমার সঙ্গে ভাব হলো। কেউ বিশ্বাস করতে চায় না—বলে কি জানো, ঐ গোমড়া মুখো ছেলেটা হীরক ওর সঙ্গে ভাব করেছিস—যাঃ ও কথা বলতে জানে নাকি? সেইজন্য তোমার একটাও বন্ধু নেই! আমরা বেশ আছি কত বন্ধু আমাদের স্কুলে আছে, বাড়ীতে আছে, পাড়ায় আছে—বেশ ভালো ভালো বন্ধু। হীরক তবু কথা বলে না দেখে কথাকলি বললেঃ তাহলে চললুম। তোমার মত ছেলের কে বন্ধু হবে?

সত্যি সত্যিই চলে গেল। হীরক ভাবছিল—পাশের বাড়ী থাকে আমি চিনি না এটা যেন লজ্জার কথা। কেন যে চিনি না তাই বুঝি না, আজ আবার রাগ করে চলে গেল।

বেশ ক'দিন কেটে গেছে। হীরক কথাকলির কথা ভুলেই গেছে। স্কুল থেকে আসবার সময় একটা দোকানে দাঁড়িয়ে রং কিনছিল। অন্য ছেলেরা পাশ দিয়ে যাবার সময় তার সম্বন্ধে কি যেন বললে তারপর জোরে হেসে উঠে তার দিকে তাকিয়ে কি বলে আর হো হো করে হাসে।

বাড়ী এসে খাবার খেতে বসে হীরক বললেঃ জানো মা, ওরা কি বলছিল?

—কে কি বলছিল? আর তোমার কানে সে কথা গেল কি করে? তুমি কি কারুর কথা শোনো?—কে বলেছে কি নাম?

—নাম? নাম তো জানি না, স্কুলে পড়ে।

—কোন্ স্কুলে? তোমাদের স্কুলে? তোমাদের ক্লাসে?

—হ্যাঁ।

—তুমি নাম জানো না? আশ্চর্য হয়ে গেলেন মা। হীরক চুপ করে রইল।

—ক্লাসের ছেলে, একসঙ্গে পড়ো নাম জানো না? ক'জনের সঙ্গে তোমার ভাব আছে?

হীরক তখনও চুপ করে আছে।

—কি কথা বলছো না কেন? কোনো ছেলেকে তো কোনোদিন বাড়ীতে আসতে দেখিনি। তাই বলছি ক'জনকে চেনো?

হীরক তবুও কথা বলে না।

মা রেগে উঠে বললেনঃ কথার উত্তর দিতেও জানো না? ভারী অসভ্য ছেলে, তোমায় নিয়ে আমার কী হবে?

হীরক আস্তে আস্তে বললেঃ আমি বিশেষ কাউকে চিনি না, মানে কথাবার্তা—

—কথাবার্তা বলো না? আমিও তাই ভাবি, তোমার মত ছেলের কি হবে? এতদিন স্কুলে পড়ছো একটা বন্ধু নেই, একটা খেলবার সঙ্গীও নেই—ঐ আছে একমাত্র ঘুড়ি। ছিঃ ছিঃ বড় হয়ে তুমি কি হবে হীরক? সেদিন তোমার বাবার বন্ধু পরেশ কাকা তোমার বাবাকে কি বলে গেলেন জানো? বললেন—তোমার মত ছেলে হয়নি কেন? একটাও কথা বলে না, বন্ধু-বান্ধব নেই। একা একা কি করে? ফুটবল খেলে বা আর কিছু? তোমার বাবা কি উত্তর দেবেন বল? উনি এত মিশুক, বন্ধু-বান্ধব পাড়া-প্রতিবেশী কত ভালবাসে—আর তুমি?

মার কাছে সেদিন খুব বকুনী খেতে হলো। হাত ধুয়ে ঘরে এসে হীরক ভাবছিল কি করা যায়? সত্যি তার বন্ধু-বান্ধব নেই। কথাকলি মেয়েটা পাশের বাড়ী থাকে তবু তাকে চিনি না, ছোট্ট মেয়েটি কত কথা শুনিয়ে গেল।

ক'দিন ধরে একই কথা ভেবে ভেবে হীরকের শরীর খারাপ হয়ে গেল। ক্লাসের টিপ্পনীগুলো আগে কানে আসতো না, এখন যেন কান দিয়েই শোনে সেগুলো, শুনতে শুনতে মুখ লাল হয়ে ওঠে।

তাদের সকলের একসঙ্গে হেসে ওঠার শব্দে হীরকের কানে যেন লাগে। কিন্তু তবু সে সহজ হতে পারে না। এরমধ্যে ক'দিন পরে কথাকলির সঙ্গে দেখা হয়েছিল—তার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে পাশে দাঁড়ানো ভদ্রমহিলাকে বলেছিল ঐ দেখ মা পাশের বাড়ীর হীরক, ওর একটাও বন্ধু নেই, কারুর সঙ্গে কথা বলে না। আমি একদিন ঘুড়ি এনে দিয়েছিলাম—সেদিন বললে তোমায় বন্ধু করবো আর পরের দিন আমায় চিনতে পারলো না—ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ।

মা বললেন: ছিঃ আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে নেই আর অমন করে কথা বলতে নেই। তারপর তার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন: তোমাদের বাড়ী আমরা যাই। তোমার ভাই তিলক তো এ বাড়ী আসে, তুমি আসো না কেন?

কোনো উত্তর না দিয়ে হীরক সোজা বাড়ী চলে এসেছিল। কাউকেই সে চেনে না, কথা বলবে কি।

অন্যমনস্কতার দরুণ সেদিন ক্লাসে পড়া হয়নি। মাষ্টারমশাই তাকেই জিজ্ঞাসা করলেন কিছুই উত্তর দিতে পারলো না, যতক্ষণ ক্লাসে মাষ্টারমশাই ছিলেন—একটু গুঞ্জন হলো, যেই তিনি চলে গেলেন আর যায় কোথায়, সারা ক্লাস হাসিতে ফেটে পড়লো।

মিহির বললে, বিদ্যাসাগরের বিদ্যা বেরিয়ে গেছে আজ বুঝলি?

পার্থ বললে, সাগর বলিসনি, বল পুকুর। এঁদো পুকুর কিম্বা ডোবা।

আবার হাসির হুররা পড়ে গেল।

স্কুল ছুটির পর এইসব ভাবতে ভাবতে আসছিল হীরক। আজ ওরা ওকে অমন বিদ্রূপ করলেও আসলে তো ওরা ভালো ছেলেই। মাষ্টারমশাইরা তো পার্থ মিহির সৌম্য দিলীপ অজিত এদের সকলকেই ভাল বলেন, ভালবাসেন—তবে আর ওরা এমন করলো কেন?

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে চলেছে হীরক—চিন্তাগুলো মাথার মধ্যে জট পাকাতে আরম্ভ করেছে যেন—।

হঠাৎ গেল গেল চীৎকার শুনে থমকে চেয়ে দেখলো একটা বিরাটকায় দৈত্যের মত দোতলা বাসের সামনে সে পড়েছে। কিছু ভাববার আগেই কে যেন তাকে জোরে ধাক্কা দিল—তারপর আর কিছু মনে নেই, সব অন্ধকার।

ক'দিন পরে ঠিক ক'দিন তা হীরক হিসেব করে বলতে পারে না। চোখ চেয়ে অনেককে দেখলো কিছু বলবার আগে মা বললেন ঃ আর কিছু ভয় নেই হীরক, তুমি ভাল হয়ে গেছ! কি যে কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছিল—বাবাঃ ভগবান এই ব্যাপারে বিশ্বাস হলো। এক চুলের জন্য বেঁচেছ—যদি মিহির ধাক্কা না দিত তোমায়। বাসের তলায় পড়ে কাগজ হয়ে যেতে। ওর খুব লেগেছে, হাতের হাড় ভেঙ্গে গেছে—তবে সেও বেঁচে গেল ঐ দোতলা বাসের বলি হওয়ার থেকে। আজ আমি মিহিরকে দেখতে যাবো—বেচারী তোমায় বাঁচিয়েছে, এমন বন্ধু আর পাবে না। তুমি তো কারুর সঙ্গে ভাব করো না, দেখলে বন্ধু কাকে বলে?

হীরক বুঝেছে বৈকি! দু'টো চোখে জল ভরে উঠেছে বললে, আমিও যাবো মা। ওরা যে আমায় ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো—ভালবাসত তাতো বুঝিনি। মা বললেন, তুমি ভাল হয়ে যাবে বৈকি! তুমি ওদের সঙ্গে মিশতে না বলেই ওরা ঠাট্টা করতো। একসঙ্গে পড়ো, এক গুরুর শিষ্য অথচ কথা বলো না—ছিঃ, কি খারাপ অভ্যাস বলো তো? ভাল হয়ে আগে ওদের সঙ্গে ভাব করে বাড়ীতে নিয়ে আসবে, ওরা তোমার বন্ধু। মানুষের জীবনে ভাল বন্ধুর বড্ড অভাব, তাই বন্ধু চাই-ই। বন্ধু না হলে কি বেঁচে থাকা যায়? সুখে-দুঃখে সব সময় তারা তোমার। তুমি তাদের বন্ধু হয়ে চলবে এই হলো নিয়ম।

হীরক ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, স্কুলে রীতিমত ক্লাস করছে—কিন্তু কি বলতো? একলা নেই আর সে। দিলীপ মিহির পার্থ সৌম্য অজিত অমিয় সকলের সঙ্গে এখন বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।

হীরক আর গম্ভীর হয়ে থাকে না—ওদের হৈ হুল্লোড় স্বাভাবিক হাসি দেখে কথাকলি বলেই ফেললো ঃ কি গো হীরকদা, বন্ধুত্ব করতে হলো না? বলেছিলাম না যার বন্ধু নেই তার কেউ নেই।

হীরক বললে, তুমি তো প্রথম বন্ধ হয়েছিলে। মুখ ঘুরিয়ে কথাকলি হাতের আঙুল দেখিয়ে বললে ঃ এইটি বন্ধু করে চিনতে পারনি আবার?

হীরক হেসে বললে, এখন সব বুঝেছি।
